"মোহনবাগানের মেয়ে?"

বহুরূপী

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৪

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
অজিতকুমার সাউ
রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
সত্য চক্রবর্তী

বাংলাদেশের ফুটবল প্রিয় দর্শকদের হাতে—

ধন্যবাদ জানাই বালীগঞ্জ ইনষ্টিটিউট কে। বইটি লিখতে গিয়ে আমাকে বিস্তর পত্র-পত্রিকার সহায়তা নিতে হয়েছে। সে সব ঝড় ঝাপটা ওদের উপর দিয়েই গেছে।

বিশ্বাস করুন, বানিয়ে বলছিনে। ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল।

তবে ঘটনা না বলে দুর্ঘটনা বলাই বোধহয় ঠিক। নইলে মহাদেববাবু যে এমন তুচ্ছ কারণে তার একমাত্র ছেলে সুবিনয়কে ত্যাজ্যপুত্র করবেন, তা কে ভাবতে পেরেছিল। নিজেই কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন কোনদিন।

অথচ ছেলে হিসেবে সুবিনযের সত্যিই তুলনা হয না। শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব চরিত্র, কোনদিক থেকেই সে পিছিযে নেই। যাকে বলে হীরের টুকরো ছেলে।

কথাটা মহাদেববাবু সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এমন সদাশিব পুরুষ এ যুগে সত্যই বিরল। ছেলেকে ভালও বাসেন যথেষ্ট। প্রমাণ সুবিনয নিজেই। স্নেহপ্রবণ পিতাকে তার চাইতে বেশী আর কে জানে।

তাহলে কেন এই অঘটন ? দোষটা কার ? কে এজন্য দায়ী ?

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, দায়ী এজন্য ইস্ট.বেঙ্গল আর মোহনবাগান।

মহাদেববাবু মোহনবাগান বলতে অজ্ঞান। তার সামান্য নিন্দাও তাঁর কাছে অসহ্য। এ ব্যাপারে অন্যে তো দূরের কথা, নিজের ছেলেকেও তিনি কোনরকম খাতির করতে প্রস্তুত নন।

অন্যদিকে ঠিক তার বিপরিত হল সুবিনয়।

মোহন—১

রাতদিন তার মুখে ইস্টবেঙ্গল—ইস্টবেঙ্গল—আর ইস্টবেঙ্গল। খেলার ব্যাপারে একমাত্র ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আর কারো প্রাধান্য-কেই সে স্বীকার করতে রাজী নয়।

বিশেষ করে মোহনবাগানের তো নয়ই। তার মতে বর্তমান মোহনবাগান আসলে ঝড়ে ভেঙে পড়া একটা বুড়ো বটগাছ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই নিয়ে সূত্রপাত।

তবে একটা ব্যাপারে··

তবে একটা ব্যাপারে দুপক্ষই সমান। মাঠে যাবার ব্যাপারে এরা কেউ ততটা উৎসাহী নয়।

মহাদেববাবু অনেক কাল আগেই ওপাট চুকিয়ে দিয়েছেন। সুবিনয় নেহাৎ ভাল খেলা থাকলে কখন-সখন গিয়ে থাকে, নইলে দুপক্ষের যা কিছু হম্বি-তম্বি সবই ঘরে বসে।

একমাত্র ব্যতিক্রম মহাদেববাবুর মেয়ের পক্ষে নাতি বলাই। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, মাঠে যাওয়া চাইই-চাই।

তবে সে যে কোন্ দলের সমর্থক তা বলা শক্ত। অবস্থা বুঝে যখন যেদিকে সুবিধে' ঝুঁকে পড়া তার চিরকালের স্বভাব।

মজার ছেলে এই বলাই। বছর দুই আগে দেশ থেকে এসে এখানেই সে স্থায়ী হয়েছে। ইতিমধ্যে সাপ্লাইয়ের বিজনেসে কিছুটা হাতও নাকি পাকিয়েছে। কিন্তু সাপ্লাইটা যে কিসের তা আজও জানা যায়নি।

অনেক প্রশ্ন করেও এ সম্বন্ধে তার কাছ থেকে কোনরকম সদুত্তর মেলেনি।

মহাদেববাবুর মতে বিজনেসটা নাকি ঘুঁটে সাপ্লাইয়ের, কিন্তু বলাই তা মানতে নারাজ। সে স্পষ্টই বলে—প্যাটে বিত্থা আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে, ঘুইটা বেচতে যামু কোন্ দুঃখে?

শুরু হয়েছিল ঠিক একবছর আগে, অর্থাৎ উনিশশ' পঁয়ষট্টি সনে।

সেদিন ছিল রাজস্থান ভার্সাস ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা। খেলাটি একশ্রেণীর দর্শকদের ইষ্টক-বর্ষণের ফলে শেষপর্যন্ত মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়।

মাঠ থেকে এবার বিবাদ চলে এল ঘরে। শুরু হল ছোট্ট একটি কথাকে কেন্দ্র করে।

সুবিনয়কে লক্ষ্য করে বলাই তখন বলছিল,—মন খারাপ কইরা লাভ নাই কুট্টিমামা। রাইত হইছে। লন যাই খাইয়া আসি।

—তুই যা। সুবিনয় গম্ভীর, আমি খাব না। খিদে নেই।

—তা থাকবে কি করে। পাশের ঘর থেকে ফোঁস করে উঠলেন মহাদেববাবু,—যে খেলা আজ ইস্টবেঙ্গল দেখিয়েছে, তার পরেও কি খিদে থাকতে পারে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যত দোষ তো ইস্টবেঙ্গলেরই। ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিল সুবিনয়,—দু দুটো সিওর গোল রেফারী বাতিল করে দিলে—

—তা তো দেবেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন মহাদেববাবু, খেলায় হারলেই যে রেফারীর দোষ, এ তো জানা কথাই। কথায় বলে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার জানা আছে। সতেজে জবাব দিল সুবিনয়, নাচের ব্যাপারে তোমাদের মোহনবাগান তো একেবারে উদয়-শঙ্কর কিনা।

—আলবৎ। একশবার। গোরাদের বিরুদ্ধেও যে জয়ী হওয়া যায় তা উনিশশো এগারো সনে মোহনবাগানই প্রথম দেখিয়েছে।

—না, তার আগেই ওটা দেখিয়েছে মন্মথ গাঙ্গুলীর ন্যাশনাল ক্লাব।

—হুঁ! কোথায় ট্রেড্‌স কাপ আর কোথায় আই. এফ. এ. শীল্ড। পেরেছিল তারা কোনদিন আই. এফ. এ. শীল্ড নিতে?

—তখন দেশীয় টীমগুলোর পক্ষে আই. এফ. এ-তে খেলার সুযোগ ছিল না বলেই পারেনি, থাকলে তাও পারত। মোহন বাগানের আগেই পারত। তাদের ক্লাব থেকেই যে তোমরা রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জী, প্রফুল্ল বিশ্বাস ও এমনি আরো কয়েক জনকে টেনে নিয়েছিলে, তা ভুলে যেও না।

—তুইও ভুলে যাসনে যে মোহনবাগান যখন আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করে সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল, তখনো তোদের ঐ ইস্টবেঙ্গলের জন্মই হয়নি। শুধু শীল্ড কেন, লীগও তোদের আগে ঘরে তুলেছি।

—তা তুলেছ, তবে ওটা খেলে নয়, ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে।

—তার মানে? ভ্রূকুটি করে তাকালেন মহাদেববাবু।

—মানে আবার কি! সতেজে জবাব দিল সুবিনয়, খেলেছিল সেবার ইস্টবেঙ্গল? খেলেছিল পরপর পাঁচবার লীগ বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং? খেলেছিল কালীঘাট? সেবার তারা লীগ বয়কট করে দূরে সরে যায়নি?

—হ্যাঁ, মোহনবাগানকে ছয় পয়েণ্ট এগিয়ে যেতে দেখে ভবেই তারা দূরে সরে গিয়েছিল। নইলে কে তাদের দেমাক দেখিয়ে সরে যাবার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছিল শুনি?

—না, তার জন্য যায়নি। দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানাল সুবিনয়, —গিয়েছিল তোমাদের আই. এফ. এ-র পক্ষপাতিত্বের বহর দেখে। নইলে বিনা যুদ্ধে সরে যাবার পাত্র আর যেই হোক, অন্ততঃ ইস্টবেঙ্গল নয়।

—ইস্টবেঙ্গল ? ভেংচি কেটে বললেন মহাদেববাবু,—তুদিনের বৈরাগী, ভাতকে বলে পেসাদ। মনে রাখিস, মোহনবাগান যা দেখিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল সাতজন্ম তপস্যা করলেও তা পারবে না। পারবে তারা ইয়া ইয়া সব গোরাদের সঙ্গে অমন করে লড়াই করতে ? লড়াই করা তো দূরের কথা, শিবদাস, বিজয়দাস, কানু রায়, অভিলাষ ঘোষ বা গোষ্ঠ পালের মত খেলোয়াড় তারা চোখে দেখেছে কোনদিন ?

—দেখব না ক্যান। জবাব দিল বলাই, তারা তো আমাগো দ্যাশেরই লোক।

—দেশের লোক তো দেশে বসে বাতাবী লেবু দিয়ে খেললেই তো পারতেন। এসেছিলেন কেন আমাদের মোহনবাগানে ?

নিমেষে দাতুর দিকে ঢলে পড়ল বলাই---মোহনবাগানে আইব না তো যাইব কই' টীম কই' ইস্টবেঙ্গল তো তখন মায়ের প্যাটে।

—হ্যাঁ, এই হল আসল কথা। আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন মহাদেববাবু, মোহনবাগান ইজ মোহনবাগান। নইলে শোভাবাজার, কুমারটুলী, টাউন, ন্যাশন্যাল, হেয়ার স্পোর্টিং—এমনি ক্লাবের অভাব ছিল না, কিন্তু সবারই নজর ছিল মোহনবাগানের দিকে। কারণ মোহনবাগান মানেই ইজ্জত। মোহনবাগান মানেই গোটা বাংলাদেশ।

—ছিল কিন্তু এখন তার সেই জমিদারী ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে ! জবাব দিল সুবিনয়, আর তার বড় ভাগটাই দখল করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

—হ্যাঁ নিয়েছে। তেড়ে উঠলেন মহাদেববাবু,—তবে সেটা খেলে নেয়নি। নিয়েছে গলাবাজী করে। মারামারি করে। যেমন আজ করেছে।

—লেখ্য কথা। জবাব দিল বলাই তবে যাই কন দাদু, খেলায় মধ্যে একটু ঝগড়া কাইজ্জা না হইলে ঠিক মউজ আসে না।

—চুপ কর। ধমকে উঠলেন মহাদেববাবু, খেলায় হেরে মারামারি করে আবার লম্বা লম্বা কথা।

—কেন, তোমাদের মোহনবাগান করেনি। মুখের উপর জবাব দিল সুবিনয় খোঁজ নিয়ে দেখোগে, মারামারির ব্যাপারে তারাও এমন কিছু ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তারাই বরং প্রথম পথ দেখিয়েছে।

—কি। কি বললি! রাগে অন্ধ হয়ে গেলেন মহাদেববাবু, মোহনবাগান মারামারি করেছে। এতবড় কথা! হতচ্ছাড়া ছেলে, তোকে—তোকে—তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।

—সতেরো বার হইল। ফুট কাটল বলাই।

—কি বললি! ঘুরে দাঁড়ালেন মহাদেববাবু!

—না, কিছু না। কইছিলাম যে—এই সীজনে এই লইয়া সতেরো বার হইল।

—সতেরো বার হোক, বা যাই হোক তাতে তোর কি। ফের যদি তুই কখনো আমার সামনে ফুট কাটবি তো তোকে—তোকেও আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।

ছুটে এলেন স্ত্রী স্বর্ণময়ী দেবী। এত চেঁচামেচি কেন। কি ব্যাপার।

—ব্যাপার আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু। খেঁকিয়ে উঠলেন মহাদেববাবু, হতচ্ছাড়ার এতবড় সাহস। বলে কিনা মোহনবাগান মারামারি করেছে।

—খুব হয়েছে। ঝঙ্কার তুললেন স্বর্ণময়ী দেবী, রাত দুপুরে তোমাকে আর মোহনবাগান মোহনবাগান করে মাথা খারাপ করতে হবে না।

—কি! কি বললে। একেবারে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন মহাদেববাবু, আমার মাথা খারাপ। এতবড় কথা! এই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ফের যদি কোনদিন এমন কথা শুনি তো তোমাকে—তোমাকেও আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।

—তা কর। মুখঝামটা দিয়ে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, এখন এসব ছেড়ে যাও দেখি ঘরে। রাতদিন কেবল মোহনবাগান আর মোহনবাগান।

মহাদেববাবু চলে যেতেই স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় আবার ফুট কাটল বলাই,—এক নিশ্বাসে তিনজন ত্যাজ্যপুত্র। নাঃ! হিম্মৎ আছে মোহনবাগানের।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে ভেসে এল মহাদেববাবুর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার—কি! কি চাই এখানে?

—খাবার দেবো কিনা জানতে এলাম। প্রত্যুত্তরে ভৃত্য কালীচরণের কণ্ঠ শোনা গেল।

—হুম! তা, কি রান্না হয়েছে এবেলা?

—আজ্ঞে আলুর দম, ইলিশ মাছের ঝাল--

—কি! কি বললি হারামজাদা! বেরো—বেরো বলছি আমার সুমুখ থেকে।

—আজ্ঞে আপনি নিজেই তো শখ করে ইলিশ মাছ নিয়ে এলেন!

—এনেছি বেশ করেছি। আরো আনব। হাজারবার আনব! তাতে তোর কি। ফের যদি তুই আবার কোনদিন আমার সামনে ও নাম উচ্চারণ করবি তো তোকে—তোকেও আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।

—ঐ শোনেন দিদিমা। এ-ঘরে স্বর্ণময়ী দেবীকে লক্ষ্য করে ফুট কাটল বলাই, দলে আর একজন বাড়ল। বাকী

রইল অ্যালসেসিয়ান কুত্তাটা। ঐটা হইলেই সেট্ পুরা হইয়া যায়।

—খুব হয়েছে। হাসি চেপে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, জানিস তো কিছু বললেই রেগে যায়। তবু যে কেন তোরা বুড়ো মানুষটার পেছনে লাগিস বুঝিনে বাপু। যাক, রান্না হয়ে গেছে। তোরা হাত-মুখ ধুয়ে নে। আমি যাই। দেখিগে আবার ওদিকে।

ওদিকে মহাদেববাবু চুপ করে বসে নেই। নিজের ঘরে বসে সমানে তিনি চেঁচিয়ে চলেছেন সেই থেকে।

—সব ক'টাকে দেখে নেব! সবাইকে দূর করে দিয়ে যাব। আমিও মহাদেব চাটুজ্যে তা যেন মনে থাকে।

—আঃ! চেঁচাচ্ছ কেন! ঘরে ঢুকে অনুযোগ দিয়ে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, হয়েছেটা কি!

—কি আর হতে বাকী রয়েছে শুনি! তেড়ে উঠলেন মহাদেব-বাবু। এতবড় সাহস! বলে কিনা মোহনব গান নাকি মারামারি করেছে। কুপুত্র। কুপুত্র নইলে এমন কথা কেউ বলে।

—হাজার হোক্ ছেলেমানুষ। হাসি চেপে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, আবদার করে না হয় একটা কথা বলেই ফেলেছে।

—আবদার! থতমত খেয়ে গেলেন মহাদেববাবু—তা, তা, আবদার যদি হয় তো সে আলাদা কথা। তেমন আবদার করতে পারলে মোহনবাগান ওদের হাতে দু'চারটে গোল খেতেও কোন দিন আপত্তি করবে না। তা বলে মিথ্যে অপবাদ দেবে কেন! তাহলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোন—

উনিশ শো উনত্রিশ সনের কথা।

খেলার মাঠে তখন পুরোপুরি গোরাদের রাজত্ব। তারা যা বলবে, তাই আইন। যা করবে তাই নিয়ম।

হাজার অন্যায় করলেও আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য। কারণ তারা রাজার জাত। আমরা পরাধীন। প্রতিবাদ করতে যাওয়া মানেই বুটের লাথি।

লীগের প্রথম খেলা। খেলা চলছে মোহনবাগানের সঙ্গে ডালহৌসীর।

হঠাৎ রেফারী ক্যামেরন সাহেব বাঁশি বাজিয়ে জানালে— গোল।

সবাই অবাক। ওদের রাইট আউট উইলিয়ামস্ যে শট করেছে সে বল তো আমাদের গোলকীপার সন্তোষ দত্তর হাতে। তাহলে গোল হল কি করে?

কে কার কথা শোনে। সাহেব রেফারী যখন গোল বলেছে, তখন গোলই!

গোলকীপার সন্তোষ দত্তর অবস্থা তখন বুঝতেই পারছ। একে জোয়ান মরদ ছেলে, তার উপর নামকরা মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে তখন বাংলার ঘরে ঘরে তার নাম।

একটু বাদেই সেই উইলিয়ামস আবার বল নিয়ে এগিয়ে গেল সন্তোষ দত্তকে চার্জ করতে।

কি ব্যাপার ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু দেখা গেল বল ক্লিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়ামস বসে পড়েছে। তার চোয়ালের হাড় দু'টুকরো হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ল গোরার দল। নেমে পড়ল পুলিস বাহিনী। মারো নেটিভ দলকে। আচ্ছা করে ঠেঙানী দাও।

আর যায় কোথায়। চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালী দর্শক-সমাজ। এতবড় হিম্মৎ তোদের। আমাদের মোহন-বাগানকে মারবি। আয় তবে।

শুরু হল মার-মার। যাকে বলে বেধড়ক মার। তারপর

কোথায় গেল পুলিস, আর কোথায় বা গোরার দল। সব একেবারে কেল্লাপার।

পরদিন সভাপতি স্যার টমাস ল্যাম্ব-এর বিচারে দু'বছরের জন্য সন্তোষ দত্তকে সাসপেণ্ড করা হল। সেই সঙ্গে শাসানো হল, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে নেটিভ দলগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ব্যস্, বিগড়ে গেল মোহনবাগান। স্পষ্ট তারা জানিয়ে দিলে যে আগে বিচার হোক, তারপর খেলা।

অনেক জুলুম আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তোমাদের চোদ্দটি ক্লাবের জন্য আই এফ. এ. কাউন্সিলে আট জন মেম্বার, আর আমাদের একশো চল্লিশটি ক্লাবের জন্য কিনা মাত্র চার জন। একি মামার বাড়ির আবদার নাকি।

হয় এর ফয়সালা কর, নয়তো আই. এফ. এ. থেকে আমাদের সমস্ত ক্লাবগুলোর নাম কেটে দাও। আমরা ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন নাম দিয়ে নতুন সংস্থা খুলব।

কথায় বলে 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'। তাই শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানের সমস্ত দাবিই তারা মানতে বাধ্য হল।

ঠিক হল এখন থেকে আই. এফ. এ. কাউন্সিলে উভয় পক্ষকে সমান সমান আসন দেয়া হবে, আর সন্তোষ দত্তর উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে।

ব্যস্, সেই থেকে আই. এফ. এ-তে ওদের একাধিপত্য চিরদিনের মত ঘুচে গেল।

এবার তুমিই বল বড়বৌ যে মোহনবাগান ঠিক করেছিল কিনা। সেদিন যদি মোহনবাগান সাহস করে অমন বেধড়ক মার না দিত, তবে কি তোরা এত শীগগীর এই সুবিধেগুলো পেতিস! বল, তুমিই বল।

তবে মিথ্যে বলব না বড়বৌ, শুধু সন্তোষ দত্ত নয়, বলাই চাটুজ্যেও মাঝে মাঝে মেরেছেন। একটু বেশীই মেরেছেন।

সত্যি বলতে কি, খেলায় তাঁর যেটুকু খামতি ছিল, তা তিনি মেরেই পুষিয়ে নিয়েছেন। একবার তো ক্যালকাটা দলের খেলোয়াড় ডু বয়-এর সিনবোনই ভেঙে দিলেন।

তবে মেরেছেন ঐ একই কারণে। অর্থাৎ আমরা খেলতে এসেছি, মারামারি করতে নয়। আর যদি মারামারি করাই তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তো এস, লড়ে যাও। আরে, এই না হলে কি গোরার দল ঠাণ্ডা হত। সন্তোষ দত্ত বা বলাই চাটুজ্যের মত ছেলেরা ছিল বলেই না। কি বল বড়বৌ ?

—সে তো ঠিকই। হাসি চেপে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, তবে আমি বলছিলাম অন্য কথা।

—কি ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন মহাদেববাবু।

—বলছিলাম যে সংসারে ঐ তো একটি মাত্র ছেলে। বয়েস হয়েছে। রোজগার-পাতিও ভালই করে। এবার ওর একটা বে-থা-র ব্যবস্থা করবে তো ?

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন মহাদেব-বাবু, ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি। সারাজন্ম তো আর মোহন-বাগানের নামে চুকলী কাটলে চলবে না। হ্যা, ভাল একটা মতলব মাথায় এসেছে। এমন কায়দা করতে হবে যাতে আজীবন বাবাজীকে মোহনবাগানের আঁচল ধরে চলতে হয়।

—তার মানে ! স্বর্ণময়ী দেবী অবাক।

—মানে মোহনবাগানের মেয়ে। খাস মোহনবাগানের মেয়ে ঘরে আনব, বুঝলে ? তারপর দেখব যে ইস্টবেঙ্গলের এত দেমাক কোথায় থাকে।

—বেশ তাই এনো। হেসে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, তবে

আমার কিন্তু ও পাড়ার নন্দবাবুর মেয়েটিকে ভারি পছন্দ। এই তো সেদিন রাস্তায় দেখা হল। লক্ষ্মী মেয়ে। বল তো খবর পাঠাই।

—বেশ পাঠাও। বলছ যখন তখন দেখে আসব। তবে ঐ আমার এক কথা। খাঁটি মোহনবাগানের মেয়ে চাই। ঐটি না হলে চলবে না।

হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে যেতে যেতে ভেতরে মহাদেববাবুর গলা শুনেই থমকে দাঁড়াল বলাই। কথাগুলো ভাল করে শুনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে পা বাড়াল সুবিনয়ের ঘরের দিকে।

—কুট্টিমামা, কাম সারছে।

—তার মানে? মুখ তুলে তাকাল সুবিনয়।

—মানে মোহনবাগানের মাইয়া। এইবার দাদু আপ্‌নের ইস্টবেঙ্গল্‌রে কায়দামত পাইয়া গেছে। অখন বোঝেন ঠেলা!

সব কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সুবিনয়। সারামুখে তার কেমন যেন একটু ভাবনা। সবুজ মিষ্টি নেশা লাগানো ভাবনা।

ভাবনার কারণ বন্ধু অবিনাশের বোন মিতা।

মিতা তার জীবনের প্রথম নারী। সে শুধু অপরূপই নয়, আকাশের মেঘমালার মতই বিচিত্র।

পরিচয় হয়েছিল দুবছর আগে। তারপর দেখতে দেখতেই দুজনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে দুজনের কাছে। আজ নিজের পাশে মিতা ছাড়া আর কাউকে চিন্তাও বুঝি করা যায় না।

অন্যান্য দিক থেকেও আশ্চর্য মিল রয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। মিতাও ইস্টবেঙ্গলের গোঁড়া সমর্থক।

অবশ্য তার কারণও আছে। কাকা দ্বিজেনবাবু ছিলেন এককালে ইস্টবেঙ্গলের নিয়মিত খেলোয়াড়। দাদা অবিনাশও ইস্টবেঙ্গলের বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে মাঝে মাঝেই খেলায়

অংশগ্রহণ করে থাকে। এ পরিস্থিতিতে মিতাও যে তাদের অনুকরণে ইস্টবেঙ্গলের গোঁড়া সমর্থক হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি।

এদিকে বাবা মোহনবাগানের মেয়ের জন্য বায়না ধরেছেন। এ ব্যাপারে তিনি যে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকুও নড়তে রাজী হবেন না। তা বলাই বাহুল্য।

ওদিকে মিতা ঠিক তার বিপরীত। ইস্টবেঙ্গল ছাড়া অন্য সব কিছুই তার কাছে তুচ্ছ। এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে!

ছোট সংসার। ভাই অবিনাশ, বোন মিতা আর বৃদ্ধা বিধবা পিসীমা হেমাঙ্গিনী দেবী।

কাকা দ্বিজেনবাবু চাকরি উপলক্ষে বরাবরই পুণাতে বসবাস করেন। ছুটি-ছাটা পেলে কখনো সখনো এসে থাকেন, তবে তাও বছরে দু-একবারের বেশী নয়।

অধুনা অফিস-ফেরত সুবিনয় রোজই একবার এখানে হাজিরা দিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে আবার সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে যায় নিজেদের হাটখোলার বাড়িতে।

আজ সুবিনয়কে আসতে দেখেই দূর থেকে পাহাড়ী ঝর্ণার মত কলকল করে ওঠে মিতা।

—এই যে! তোমার কথাই ভাবছিলাম। কি অন্যায় বল, তো। কাল আমাদের দু-দুটো সিওর গোল কিনা এভাবে বাতিল করে দিলে। দাদা নিজে মাঠে ছিলেন। বললেন,—একটা অফসাইড ছিল ঠিকই, কিন্তু অন্যটা সিওর গোল। আসলে এগুলো ইস্টবেঙ্গলকে চেপে রাখবার মতলব ছাড়া কিছুই নয়। তোমার কি মনে হয়?

—তাই হবে হয়তো। জবাব দিল সুবিনয়। গলার স্বরে অবসন্নতা।

—নিশ্চয় তাই। উৎসাহের আতিশয্যে মুখর হয়ে উঠল মিতা, তা ছাড়া আর কি হতে পারে। আমার তো মনে হয় এ ব্যাপারে শক্ত হওয়া উচিত। ওরা যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে, তার কোন মানে নাই। কি বল।

—হুঁ। সুবিনয় অন্যমনস্ক। বেশ বোঝা যায় মিতার কোন কথাই তার কানে যায়নি।

—কি ভাবছ এত? সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন খটকা লাগে মিতার।

—কই, কিছু না তো। ম্লান মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে সুবিনয়।

—তাহলে কথা বলছ না কেন? শরীর খারাপ হয়নি তো?

- না, তেমন কিছু হয়নি। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একটা হতাশার সুর বেজে ওঠে সুবিনয়ের কণ্ঠে, অবিনাশ কখন আসবে?

—আসবে এখুনি। আর কোন প্রশ্ন করল না মিতা। প্রশ্ন করল না বটে তবু একটা চঞ্চল জিজ্ঞাসা জমাট বেঁধে রইল সর্বক্ষণ।

কেন আজ সুবিনয়ের এই নির্বিকার ঔদাসীন্য? কি হয়েছে ওর?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল অবিনাশ। সুবিনয়কে দেখেই সে সহাস্যে বলল—কিরে, তুই কতক্ষণ।

—এই তো কিছুক্ষণ হল। কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা আনতে চেষ্টা করে সুবিনয়, তারপর তোর এত দেরি হল যে আজ। ক্লাবে গিয়েছিলি বুঝি? কালকের ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু শুনলি?

—রাজস্থানকে দু পয়েন্ট দিয়ে দেয়া হয়েছে। জবাব দিল অবিনাশ, আর শুনেছি ইস্টবেঙ্গলকে নাকি সাসপেণ্ড করা হবে।

—ছাই! অধরোষ্ঠে শ্লেষ দেখা দিল মিতার, ইস্টবেঙ্গল না খেললে পয়সা দিয়ে খেলা দেখবে কে। আই. এফ. এ. এত বোকা নয়।

—তা ঠিক। ইস্টবেঙ্গল না থাকলে দর্শকদের খেলায় কোন ইণ্টারেষ্টই থাকবে না। সমর্থন জানাল অবিনাশ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিল সুবিনয়। অন্যদিনের মত ইস্টবেঙ্গলের প্রসঙ্গ নিয়ে মাতামাতি করতে এতটুকু উৎসাহ দেখা গেল না তার।

মিতাকে এড়াতে পারলেও শেষ পর্যন্ত বলাইকে কিন্তু আর কোনমতেই এড়াতে পারল না সুবিনয়।

দেখা হতেই সে চেপে ধরল,—কি হইছে, বেবাক আমারে খুইলা কন। কন, কাইল থিকা এমন চোরের মত গাল বুতাইয়া রইছেন ক্যান?

—না না, কিছু হয়নি আমার। প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে সুবিনয়।

—হ হ, বুঝছি, বুঝছি। ঐ সব ভুজুং-ভাজুং ছাড়ান দিয়া মাইয়াটা কে কি বৃত্তান্ত, বেবাক আমাকে খুইলা কন। মনে রাইখেন যে বলাই হালদার দিনরে রাইত করতে পারে। কন, কি হইছে। বেবাক খুইলা কন।

খুলেই বলল সুবিনয়। বয়েসে বছর খানেকের ছোট হলেও বলাই করিৎকর্মা ছেলে।

চেষ্টা করলে সে হয়তো কোন একটা উপায় বাতলে দিলেও বা দিতে পারে। দেখাই যাক না।

সব কথা শুনে বলাই হেসেই খুন।

—এই ব্যাপার। নাঃ, আপনে হাসাইলেন কুট্টিমামা। ঠিক আছে, যা করণের আমিই করুম। আপনে নাকে ত্যাল দিয়া ঘুমান গিয়া।

বলাই সত্যই করিৎকর্মা লোক। একটু পরেই সে গিয়ে হাজির হল তার দাদুর ঘরে।

একথা-সেকথার পরে অবশেষে এক সময়ে সে টোপ ফেলল,—নাঃ। ভাইবা দেখলাম কামটা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে খুব খারাপই হইছে। খ্যালা লইয়া ঝগড়া-কাইজা করন ঠিক না।

—বল, তুই বল। নিমেষে নাতির উপর সদয় হয়ে উঠলেন মহাদেববাবু, আর ঐ হতচ্ছাড়াটা বলে কিনা—ঠিক আছে, আমিও মহাদেব চাটুজ্যে। কি করে দেমাক ভাঙতে হয় তা আমার ভাল করেই জানা আছে।

—হ হ, শুনছি, শুনছি। একগাল হেসে বলল বলাই, দিদিমার মুখে বেবাক শুনছি। আপনে যত শীগগীর পারেন, কামটা সাইরা ফালান, তারপর দেইখা লমু কত ধানে কত চাউল হয়। ত্যাল ছুটাইয়া দিমু না!

—ঠিক ঠিক। খুশি ভরে বললেন মহাদেববাবু, দেরি মোটেই করব না। কালই কালীচরণকে দিয়ে নন্দবাবুর কাছে খবর পাঠিয়ে দেব।

—এইটা কিন্তু ঠিক হইল না দাদু। আগ বাড়িয়ে বলল বলাই, নতুন কুটুমের বাড়ি কি চাকর-বাকর দিয়া খবর পাঠান ঠিক হইব? তার থিকা আমি নিজে গিয়া বরং খবর দিয়া আসুম।

—তাহলে তো ভালই হয়। বলবি যে—আমি পরশুদিন বিকেলে যাব।

খবর শুনে হাতে যেন চাঁদ পেলেন নন্দবাবু।

মহাদেব চাটুজ্যের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, এ তো ভাগ্যের কথা। এমন সৌভাগ্য কজনের হয়। তাঁর যখন পছন্দ হয়েছে, তখন তো আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—পছন্দ হইব না কেন। বিনযে গলে গেল বলাই, দাদু আমার শিবতুল্য লোক। পাড়ার দশজনে মান্যি-গণ্যি করে। দোষের মধ্যে একটু খ্যাপা-পাগলা। ইস্টবেঙ্গল কইতে একেবারে অজ্ঞান।

—তাই বুঝি। সকৌতুকে বললেন নন্দবাবু।

—তবে আর কইতে আছি কি! রাইত দিন খালি ইস্টবেঙ্গল আর ইস্টবেঙ্গল। এই ব্যাপারে যদি একটু তাল দিয়া চলতে পারেন তো আর কোন কথাই নাই। যাউক, আমার নাম আবার কইয়েন না যেন। হয়তো ভাবব যে শিখাইয়া দিছি। তবে একটা কথাই খালি মনে রাখবেন যে—ইস্টবেঙ্গল।

মেয়ে দেখে খুশিই হলেন মহাদেববাবু। ঠিকই বলেছিল বড়বৌ। মেয়েটি সত্যিই সুলক্ষণা। দেখতে শুনতে চমৎকার। বেশ মানাবে ছুটিকে।

—ভাল করে দেখে শুনে নিন চাটুজ্যে মশাই। সৌজন্য দেখিয়ে বললেন নন্দবাবু, আপনার সম্মতি পেলে—

—এর আর দেখাদেখির কি আছে। খুশি ভরে জবাব দিলেন মহাদেববাবু, মা লক্ষ্মীকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এখন

একটা ভাল দিন-ক্ষণ দেখে কাজটা সেরে ফেললেই হয়। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। বলছিলাম যে—খেলাধূলো তোমার কেমন লাগে মা?

—বেশ লাগে। অস্ফুট কণ্ঠে জবাব ছিল নন্দবাবুর মেয়ে স্বপ্না।

—লাগতেই হবে। উৎসাহ-প্রদীপ্ত কণ্ঠে বললেন মহাদেববাবু, একটা জাতের পরিচয় তো তার খেলাধূলোর মধ্য দিয়েই। তা কাদের তুমি সবচাইতে বেশি পছন্দ কর মা? মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল।

—ইস্টবেঙ্গল। একই ভাবে জবাব দিল স্বপ্না।

—ইস্টবেঙ্গল! মহাদেববাবু স্তম্ভিত।

—আর বলেন কেন! এবার মেয়ের স্বপক্ষে যোগ দিলেন নন্দবাবু, মেয়ে আমার ইস্টবেঙ্গল বলতে একেবারে অজ্ঞান। আর হবে নাই বা কেন। বাংলাদেশে সত্যিকার টীম বলতে তো ঐ একটাই মাত্র আছে।

—ও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মহাদেববাবু।

—একি! নন্দবাবু অবাক, এরি মধ্যেই উঠছেন যে। মুখে একটু জল-টল না দিয়ে—

—থাক, তার আর দরকার হবে না। কথাটা বলেই হন হন করে বেরিয়ে এলেন মহাদেববাবু। আর ফিরেও তাকালেন না।

স্বামীকে ফিরতে দেখেই হাসি মুখে এগিয়ে গেলেন স্বর্ণময়ী দেবী। হ্যাঁগা মেয়ে দেখলে? কেমন লাগল?

—দূর। দূর। একি একটা মেয়ে নাকি! অসহিষ্ণু গলায় বললেন মহাদেববাবু,—এ তো দস্তুরমত কালো।

—কালো! স্বর্ণময়ী দেবী অবাক, সেদিন নিজের চোখে দেখলাম। অমন ফুটফুটে গায়ের রং—

—না না, কালো নয়, কালো নয়। নিমেষে নিজের বক্তব্য ঘুরিয়ে নিলেন মহাদেববাবু, তবে দাঁতগুলো বড্ড উঁচু। ঠিক মূলোর মত।

—বলি নেশা-টেশা শুরু করেছ নাকি। মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, নইলে অমন সুন্দর যার মুখশ্রী—

—মুখশ্রী! খেঁকিয়ে উঠলেন মহাদেববাবু, বলি মুখশ্রী দেখলেই চলবে! অন্যসব মিলিয়ে দেখতে হবে না মেয়ের অভাব কি! রসময়কে বললে এক্ষুনি গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ের খোঁজ এনে দেবে। আমি কালই যাচ্ছি ওর কাছে।

•

যে কথা সেই কাজ। পরদিন গিয়ে মহাদেববাবু হাজির হলেন বন্ধু রসময় চৌধুরীর আস্তানায়।

দুজনে একই পথের পথিক। দুজনেই মোহনবাগানের একনিষ্ঠ ভক্ত। বাড়িও দুজনের একই অঞ্চলে।

দেখতে দেখতেই দুজন আত্মহারা হয়ে গেলেন মোহনবাগানের অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় নিয়ে।

কত কথা। কত আবেগ। বয়েসকালে অফিস পালিয়ে মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাবার কত কৌতুকের কাহিনী। সে যেন আর এক জীবন।

—তা যা বলেছ ভাই। হাসতে হাসতে একসময়ে বললেন রসময়বাবু, একবার তো মাঠে একেবারে ম্যানেজার ডানহাম সাহেবের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস কিছু বলেন নি। আর বলবেনই বা কোন মুখে। সাহেব নিজেই তো ছিলেন

ক্যালকাটার মস্তবড় একজন সাপোর্টার। সে যাকগে, এবার কি হবে মনে হয়? পারবে কি মোহনবাগান এবারও লীগ নিতে?

—আলবৎ! দৃঢ়স্বরে বললেন মহাদেববাবু, পরপর তিনবার নিয়েছে, এবারও নেবে। চুণী, জার্নাল, অরুময়, দীপু দাস, দেবনাথের মত এমন সোনার টুকরো ছেলেরা থাকতে ভাবনা কি।

—তা ঠিক। তবে ইস্টবেঙ্গল কি এত সহজে ছাড়বে। ওদেরও তো রামবাহাদুর, সমাজপতি, অসীম, পরিমল, শান্ত মিত্র, সব বাছা বাছা ছেলেরা রয়েছে। এ অবস্থায় ওরাই বা ছেড়ে কথা কইবে কেন।

—আরে রেখে দাও তুমি ওদের কথা। কোথায় মোহনবাগান আর কোথায় ইস্টবেঙ্গল। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে। একটি ভাল মেয়ে দেখে দিতে হবে যে। ছেলের মা আবদার ধরেছে যে ঘরে বৌমা না হলে নাকি চলবে না।

—এ তো ভাল কথা। উৎসাহ ভরে বললেন রসময়বাবু, তা মেয়ের অভাব কি। আমি এক্ষুনি কয়েকজনের খোঁজ দিয়ে দিচ্ছি, তুমি সময়মত নিজে গিয়ে দেখে এস। তবে যাবার আগে খবর পাঠিয়ে যেয়ো।

বলাইয়ের সত্যিই তুলনা হয় না। অধুনা দাদুর সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব। তার যাবতীয় কাজকর্ম এখন সে-ই দেখা-শোনা করে থাকে।

ওদিকে মহাদেববাবুর অবস্থাও তাই। বলাইকে নইলে এক মুহূর্তও চলে না। কবে কোথায় কাকে কি খবরাখবর করতে হবে, সব কিছুই এখন বলাই।

শুরু হল পাত্রী দেখার কাজ। দেখাও হল প্রচুর। দেখতে শুনতে তারা খারাপ নয়। ঘরও বেশ ভাল।

কিন্তু বিপদ হল এক জায়গায়। আশ্চর্য, যেখানে যাওয়া যায় সর্বত্রই শুধু এক রব—ইস্টবেঙ্গল, ইস্টবেঙ্গল আর ইস্টবেঙ্গল!

বলাইয়ের কল্যাণে বাংলাদেশের যাবতীয় পাত্রীরা যে এক-জোট হয়ে ইস্টবেঙ্গলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে সে খবর মহাদেববাবুর সত্যই জানা ছিল না।

অবশেষে একদিন স্বমূর্তি ধারণ করলেন স্বর্ণময়ী দেবী।—বলি পেয়েছটা কি। ছেলেটাকে কি আইবুড়ো করে রাখতে চাও নাকি?

—না না, তা কেন। সাফাই গাইতে চেষ্টা করলেন মহাদেববাবু, চুপ করে হাত পা গুটিয়ে আর তো বসে নেই। কিন্তু পছন্দ না হলে—

এতগুলো মেয়ের মধ্যে একটাও তোমার পছন্দ হল না! থাক, তোমাকে আর পছন্দ করতে হবে না। আর একমাস আমি দেখব, তারপর যা করার নিজেই করব। তখন যেন আবার নাক গলাতে এস না।

কথাটা বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন স্বর্ণময়ী দেবী। পরক্ষণেই হুম হুম করে পা ফেলে চলে গেলেন হেঁসেলের দিকে। আর ফিরেও তাকালেন না।

সুযোগ বুঝে পেছনে পেছনে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল বলাই, —দিদিমা গো, মাইয়ার কথা যখন কইলেন, তখন আমি একখান কথা কই। কাইল মাণিকতলার দিকে একখান মাইয়া যা দেখলাম, তা আর কি কমু। আঃ! কুট্টিমামার লগে যা মানাইব!

—ও ভাবে দেখলে কি আর চলে। জবাব দিলেন স্বর্ণময়ী দেবী, কাদের মেয়ে, কি বৃত্তান্ত

—আরে মর্। আপ্নে কি আমারে পোলাপান ভাবছেন নাকি। মাইয়ার ভাইয়ের লগে আলাপ কইরা বেবাক খবর নিছি। কি যেন নাম। হ, মনে পড়ছে। মিতা, মিতা মুখার্জী। বাড়িতে সবাই আদর কইরা মিঠু কইয়া ডাকে। আঃ! যেমন সোন্দর নাম, তেমন সোন্দর চেহারা। দাদুরে কইয়া যদি একবার—

—তারা এখন বিয়ে দিতে রাজী আছে তো?

—রাজী মানে। তারা তো একপায়ে খাড়া। তবে বাপ-মা নাই! তা না থাকল। আমরা তো আর তার বাপ মারে বিয়া করতে যাইতে আছি না—কি কন? তবে ভাই আছে, কাকা আছে, অভিভাবক কইতে তারাই। অখন দাদুরে যদি একবার—

—ঠিক আছে, আমি ওকে বলছি। সম্মতি জানালেন স্বর্ণময়ী দেবী।

—ব্যস্, হইয়া গেল। একগাল হেসে বলল বলাই, ঠাকুরের ইচ্ছায় কামটা যদি হইয়া যায় তখন আপ্নেরাই আবার কইবেন যে, হ, বলাই একখান কথা কইছিল।

প্রায় নাচতে নাচতে সুবিনয়ের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বলাই।

কাজ প্রায় হাসিল। এখন ঝুঁটিমামা যদি ট্রেনিং দিয়ে ও-পক্ষকে ঠিকমত ম্যানেজ করে নিতে পারে তবে আর ঠেকায় কে।

কাজটা কিন্তু খুব সহজ হল না সুবিনয়ের পক্ষে। [illegible] শুনেই বেঁকে বসল মিতা।

অসম্ভব! ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আর কাউকে সমর্থন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল দাদা অবিনাশ। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে কাজটা চালিয়ে নিতে দোষ কি! আসলে এটাও তো একটা খেলাই।

কোন জবাব দিল না মিতা। প্রতিবাদও করল না। শুধু তার চোখের তারায় ফুটে উঠল স্বীকৃতির একটি গোপন স্বাক্ষর।

পাত্রী দেখে মহাদেববাবু আত্মহারা। সত্যই অপূর্ব!

গত একমাসে কম মেয়ে দেখা হয়নি, কিন্তু এ মেয়েটির সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। যেমন রূপ তেমনি গুণ। যাকে বলে চোখ-জুড়নো মেয়ে।

এবার প্রশ্ন করার পালা। প্রশ্ন অবশ্য একটাই। অর্থাৎ—ইস্টবেঙ্গল, না মোহনবাগান।

—মোহনবাগান। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল মিতা।

—অ্যাঁ! প্রায় লাফিয়ে উঠলেন মহাদেববাবু, মোহনবাগান! ব্যস্, ব্যস্, আর কিছু আমি চাইনে। আরে এই তো হল আসল কথা। আর ঐ হতচ্ছাড়াটা বলে কিনা—সে যাকগে তা একটু ঝগড়া-টগড়া করতে পার তো মা?

—ঝগড়া! মিতা অবাক। একি অদ্ভুত কথা!

—তা পারে বৈকি! ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে হেসে জবাব দিল অবিনাশ, বলতে গেলে রাতদিন তো আমার পেছনে লেগেই আছে।

—ভাল হবে না কিন্তু দাদা! কালো সাপের মত বেণী দুটোকে পেছনে ঠেলে দিয়ে কটাক্ষ হানল মিতা।

—ঐ শুনুন। হা-হা করে হেসে উঠল অবিনাশ।

—ব্যস্, ব্যস্, এই তো চাই। খুশি ভরে জবাব দিলেন মহাদেববাবু,– হ্যাঁ মা, তুমি পারবে। দরকার হলে এমনি করে কোমর-বেঁধে ঝগড়া করতে হবে। ঐ হতচ্ছাড়াটাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মোহনবাগান মোহনবাগানই। সেদিনের বৈরাগী ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না।

নির্বিঘ্নেই বিয়ের পর্ব চুকে গেল।

ছোটকাকা দ্বিজেনবাবু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আসতে পারেননি। তিনি মিলিটারী মানুষ। সীমান্তের পরিস্থিতি দস্তুরমত ঘোরাল। এ সময়ে চাইলেই ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়!

তবে না এলেও কাজকর্মের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হল না। বলাই একাই একশ'। এ ব্যাপারে সে বরকর্তা ও কন্যাকর্তা দুইই।

যথাসময়ে বউ নিয়ে বাড়িতে এসে একেবারে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন মহাদেববাবু।

সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে কি তাঁর আস্ফালন।

—খুব তো আমাকে কথা শোনানো হয়েছিল। এখন, এখন কি হল। এবার মিলিয়ে নাও। এ তোমাদের ইস্টবেঙ্গলের মেয়ে নয় বড়বৌ, যাকে বলে একেবারে খাস মোহনবাগানের মেয়ে। ওসব ইস্ট-ফিস্টের চালাকী এখানে চলবে না। আর কেশ ঝগড়া করতে পারে। তোমার চাইতেও ভাল পারে। এবার বাছাধন টের পাবে যে মোহনবাগান কী চীজ! কিছু বললে অমনি ক্যাঁক্ করে টুঁটি চেপে ধরবে না!

দেখে যেন আর সাধ মেটে না স্বর্ণময়ী দেবীর। আহা, বৌমার সত্যই তুলনা হয় না। মা-লক্ষ্মীর যেমন রূপ তেমনি গুণ। এমন বউ দশজনকে দেখিয়েও সুখ।

—হইব না কেন! বাহাদুরী দেখিয়ে বলল বলাই, রমেশ পালের নিজের হাতের তৈরি। অর্ডার দিয়া নিজে সামনে থাইকা দেইখা-শুইন্না গড়াইয়া আনছি। খারাপ হইব কোন্ দুঃখে।

—তা ঠিক। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে সমর্থন জানালেন মহাদেববাবু, —আমাদের বলাইটার বেশ পছন্দ আছে।

—হ হ, যত আদর খালি মুখেই। ছদ্ম অভিমানের সুরে বলল বলাই, কই, একবারও তো কইলেন না যে বলাই, আয় এই লগে তোরও একটা বিয়া-সাদীর ব্যবস্থা কইরা দেই।

—পাগল ছেলের কথা শোন! হা হা করে হেসে উঠলেন মহাদেববাবু,—হবে, হবে, অত ব্যস্ত কেন। আগে তোর ঘুঁটে সাপ্লাইয়ের বিজনেসটা একটু ভাল করে দাঁড়াক, তারপর সব হবে।

—এইটা আপ্নে খামাকা কথা কন দাদু। প্রতিবাদ জানাল বলাই, প্যাটে বিদ্যা আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে। ঘুঁইটা বেচতে যামু কোন্ দুঃখে?

—আলবৎ তুই ঘুঁটে সাপ্লাইয়ের বিজনেস করিস। ঠাট্টা করে বললেন মহাদেববাবু,—নইলে জিজ্ঞেস করলে চেপে যাস কেন?

—আরে মর্, বলাইয়ের কণ্ঠে অনুযোগের সুর,—এইটা কি সরকারী বাজেট্ নাকি যে যখন খুশি ফাঁস কইরা দিমু। বিজনেস সিক্রেট ফাঁস হইয়া গেলে থামু কি?

—তার মানে নিশ্চয়ই তুই বেআইনী কিছু করিস, যার জন্য জানতে চাইলেই এড়িয়ে যাস।

—কি যে কন দাদু! বলাই হালদার সিধা সরল লোক। ঐ-সব আকামের মইধ্যে তারে কোনদিনও পাইবেন না। বিশ্বাস না [illegible] তো আমার কথা মিলাইয়া নিয়েন। দিন তো আজই ফুরায় হইয়া যাইতে আছে না।

পরিপূর্ণ নিটোল আনন্দে ভরপুর এক-একটা দিন।

শুধু বৌমা, বৌমা, আর বৌমা। অধুনা বৌমা হাত পাখাটি নিয়ে কাছে না বসলে খেয়ে আর তৃপ্তি পান না মহাদেববাবু।

কল্কের আগুনটি, তাও অন্যে দিলে চলবে না।' ধোপার হিসেব, সংসারের খরচপত্রের হিসেব, কাকে কি দিতে-থুতে হবে, সে তো বৌমা ছাড়া একেবারে অচল।

আর ঘুমের আগে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়া, সে তো বৌমা ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না।

লীগ খেলা শেষ। সবার শীর্ষে মোহনবাগান। এই নিয়ে পর পর চারবার।

মহাদেববাবু নির্বিকার। এ নিযে এতটুকুও মাথাব্যথা নেই তাঁর।

কেনই বা থাকবে। ঘরে যেখানে সাক্ষাৎ মোহনবাগানের মেয়ে রয়ে গেছে, সেখানে এ যে হবে তা তো জানা কথাই। শুধু লীগ কেন, শীল্ডও এবার আসবে। অমন পয়মন্ত বৌমা থাকতে ভাবনা কি!

—শুরু হোক, তখন দেখা যাবে। অসহিষ্ণুভাবে জবাবটা ছুঁড়ে দিল সুবিনয়, ক্ষমতা থাকলে তোমার বৌমা যেন এখন ইস্টবেঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখে।

—আলবৎ রাখবে। মহাদেববাবু নিশ্চিন্ত, প্রমাণ তো হাতে হাতেই পেয়ে গেলি। পারলি লীগ নিতে?

—জবাবটা শীল্ডেই পেয়ে যাবে।

– ঘণ্টা করবে। ঘণ্টা করবে। হাতের বুড়ো আঙুল দুটো নাচাতে নাচাতে ফুঁসে ওঠেন মহাদেববাবু, তোদের দৌড় কতখানি তা এবারই বোঝা গেছে।

হঠাৎ স্যুট্ করে কেটে পড়ল বলাই। সঙ্গে সঙ্গে একদৌড়ে অন্দরে ঢুকে সে মিতাকে লক্ষ্য করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—শীগগীর আসেন কুট্টিমামী। ওদিকে রাম-রাবণে যুদ্ধ শুরু হইয়া গেছে। যান, থামান গিয়া।

ত্রস্তে ছুটে গেল মিতা। অধুনা এই বিবাদমান দুপক্ষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করা বলতে গেলে তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ।

ওদিকে মহাদেববাবু তখন সমানে চেঁচিয়ে চলেছেন,—কাদের দৌলতে তোরা ফুটবল চোখে দেখেছিস। কে তোদের খেলা চেনাল। দুদিনের বৈরাগীদের মুখে আবার লম্বা লম্বা কথা।

—কেন বলব না। মুখের উপর উত্তর দিল সুবিনয়, দুদিনের বৈরাগীরা যা দেখিয়েছে তোমাদের বুড়ো মোহনবাগান সারাজন্মে তা দেখাতে পেরেছে? ক'বার শীল্ড নিয়েছে ঘরে! তা যদি কেউ নিয়ে থাকে তো এই দুদিনের বৈরাগীরাই নিয়েছে! চোদ্দজনের বিরুদ্ধে এগারোজন খেলে নিয়েছে।

—কি! কি বললি হতভাগা! বোমার মত ফেটে পড়লেন মহাদেববাবু, মোহনবাগান চোদ্দজনে খেলে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তোকে—তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।

—বাবা! তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মহাদেববাবুর হাত ধরল মিতা,—আপনি চুপ করুন বাবা।

—কেন চুপ করব? সমান তেজে জবাব দিলেন মহাদেববাবু, আমি ওর বাপেরটা খাই যে চুপ করব? হতচ্ছাড়া ছেলের এতবড় সাহস! বলে কিনা মোহনবাগান নাকি চোদ্দজনে খেলে।

—যে অবুঝ, তার সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই বাবা। স্বামীকে ইঙ্গিত করে বলল মিতা, শুধু শুধু তাতে অশান্তি বাড়ে। চলুন, আপনি ঘরে চলুন।

—ঠিক। খুব সত্যি কথা। বৌমার হাত ধরে ঘরে যেতে যেতে মন্তব্য করলেন মহাদেববাবু, অবুঝের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াটাও একটা ঝকমারি। নইলে কোথায় মোহনবাগান আর কোথায় ইস্টবেঙ্গল? হুঁঃ।

—নাঃ। কপাল বটে কুট্টিমামীর। দাদুকে চলে যেতে দেখেই ফুট কাটল বলাই, আইতে না আইতেই মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ন। এর পর শীল্ড পাইলে দাদু বোধহয় কুট্টিমামীর বেবাকগুলি দাঁত সোনা দিয়া বান্ধাইয়া দিব।

অবশেষে একদিন শুরু হল সেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের শীল্ড ফাইনাল খেলা।

বাড়ির প্রতিটি প্রাণী উদ্বিগ্ন। সবাই গোল হয়ে বসে আছে রেডিওর সামনে। আজ আই এফ এ. শীল্ড ফাইনাল। কি হবে কে জানে।

একমাত্র ব্যতিক্রম বলাই। সে মাঠে গেছে। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক মাঠে যাওয়া তার চাইই

মহাদেববাবুর ঠিক পাশেই বসেছে মিতা। আজ আর এক মুহূর্তও তিনি বৌমাকে চোখের আড়াল হতে দিতে রাজী নন।

কি জানি, বৌমা আড়ালে গেলে মোহনবাগানের অনিবার্য জয়টা যদি কোনরকমে ফসকে যায়! বলা তো যায় না।

বেতারে ধারা-বিবরণী দিচ্ছেন শ্রীকমল ভট্টাচার্য। সুন্দরের উপাসক তিনি, তাই খেলার সব কিছুই বুঝি তাঁর কাছে সুন্দরে ভরা।

একটানা তিনি বলে চলেছেন—

'বল পেয়ে জার্নাল সিং সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা শট্ দিয়েছেন।

ভারী সুন্দর শট্। এবার বল চলে গেছে সমাজপতির পায়ে। ভারি সুন্দর ভাবে বলটা ধরেছেন তিনি।

এবার তিনি সুন্দর ভাবে বল নিয়ে এগুচ্ছেন। ভারী সুন্দর ভাবে সবাইকে কাটিয়ে এগিয়ে গেছেন একেবারে পেনাল্টি সীমানা বরাবর।

বাধা দিলেন দেবনাথ। না, দেবনাথের ফাউল। ভারী সুন্দর ফাউল করেছেন তিনি।'

এবার শ্রীঅজয় বসু। এবার শুরু হল তাঁর কাব্যিক ব্যঞ্জনা।

'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বর্ষণ চলেছে। আবার ফাঁকে ফাঁকে কখনো বা দেখা দিচ্ছে সোনালী সূর্যের ঝিকিমিকি। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে হাল্কা ছোট ছোট সাদা মেঘের আস্তরণ।

চারিদিকে জনসমুদ্র। তাদের মনেও আজ ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিচ্ছে এমনি আলোছায়ার আলপনা। কখনো আশা। কখনো বা উদ্বেগ।

সবার মনে গুঞ্জন তুলেছে একই প্রশ্ন। তাদের প্রিয় দলটি কি আজ বিজয়লক্ষ্মীর গলার মালাটি ছিনিয়ে নিতে পারবে! কে জানে!

আপাততঃ এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। কারণ খেলা এখনো অমীমাংসিত ভাবে চলছে। কোন দলই এখনো পর্যন্ত গোল করতে পারেনি।

বল এখন চুণীর পায়ে। অরুময়ের কাছ থেকে বল পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছেন ইস্টবেঙ্গলের গোল সীমানা বরাবর।

বাধা বন্ধনহীন জনস্রোতের মতই তিনি আপন ছন্দে এগিয়ে চলেছেন এক এক করে সমস্ত বাধা-বিপত্তি পর্যুদস্ত করে।'

—শোন বৌমা, ভাল করে শোন। গর্বভরে বললেন মহাদেববাবু, এই হল আমাদের চুণী। ওর খেলার স্টাইলই আলাদা।

—আর রামবাহাদুর, সমাজপতি, মৌলিক, পরিমল, ওরা বুঝি ক্যালনা হয়ে গেল? প্রতিবাদ করল সুবিনয়।

—আরে যা যা! তাচ্ছিল্য ভরে বললেন মহাদেববাবু, চুণী যে কি জিনিস তা সারা দেশের লোককে জিজ্ঞেস করগে। কপাল খারাপ তাই এদেশে জন্মেছিল। অন্য কোন দেশ হলে মাথায় তুলে রাখত।

বল নিয়ে চুণী একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। ফাঁকা গোল। বাধা দেবার কেউ নেই।

শট্ করলেন তিনি। গো—না, হল না, বলটা সজোরে বারে লেগে ফিরে এসেছে

—যত সব! নিমেষে ধারণাটা পালটে গেল মহাদেববাবুর, দিলে ধরা বাঁধা গোলটা নষ্ট করে। আরে, এসব হল সামাদের কাজ। যাকে বলে একেবারে ইঞ্চিমাপা শট। এ কি সবাইকে মানায়।

—সত্যি, কি অন্যায় বলুন তো বাবা। আড়চোখে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে হাসি চেপে বলল মিতা, খালি কায়দা আর কায়দা। একটু আগে শট্‌টা করলে ঠিক গোল হয়ে যেত।

—নাকি! বিদ্রূপে মুখর হয়ে ওঠে সুবিনয়, তা এতই যখন বুঝনে ওয়ালী হয়েছেন, তখন প্যাণ্ট পরে মাঠে নেমে গেলেই তো হয়।

—হ্যাঁ, তাই যাবে। দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলেন মহাদেববাবু, ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে খেলার জন্য এখন থেকে আমাদের রেগুলার প্লেয়ারদের আর দরকার হবে না। বৌমার মত মেয়েরাই পারবে।

'থঙ্গরাজের লম্বা শট্ থেকে এবার বল পেয়েছেন প্রশান্ত। প্রশান্তের কাছ থেকে সীতেশ দাশ। সীতেশের কাছ থেকে শম্ভু। শম্ভু পাস করে দিয়েছেন পরিমলকে। হরিণের মত ছুটছেন পরিমল। বিদ্যুৎ, রহমান, জার্নাল, দেবনাথ সবাইকে কাটিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছেন পেনাল্টি সীমানার মধ্যে।'

গেল—গেল—গেল। মনে মনে দুর্গা নাম জপ করতে লাগলেন মহাদেববাবু। মান-ইজ্জৎ সব গেল আজ।

'আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন পরিমল। বাধা দেবার মত কেউ নেই কাছে-কিনারে। অবধারিত গোল।

কিন্তু না, সমাপ্তির বাঁশি বেজে উঠেছে। খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল। কোন পক্ষই গোল করতে সক্ষম হয়নি। উভয় পক্ষই সমান।'

নিমেষে বাড়ির চেহারা পালটে গেল। দুপক্ষই সমান সমান। কেউ ছোট নয়। কেউ বড় নয়। কোনরকম ঝগড়া বিবাদ নয়। তর্ক-বিতর্কও নয়। বরং সব কিছুই যেন আজ বিপরীত

রাত্তিরে খেতে খেতে মহাদেববাবুই সর্বপ্রথম কথা তুললেন— এই ভাল হল, বুঝলে বৌমা। সব সমান। তাছাড়া তর্কের খাতিরে যাই বলিনে কেন, লড়িয়ে টীম হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হবে।

—তা যদি বল তো মোহনবাগান। সুবিনয়ও আজ মোহন-বাগানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ,—তখনকার দিনের গোরা টীমগুলোর বিরুদ্ধে কি লড়াইটাই না লড়েছে।

—কেন ইস্টবেঙ্গল লড়েনি? মহাদেববাবুও পিছিয়ে থাকতে রাজী নন,—যখনই কোন বিদেশী টীম এদেশে এসেছে, তখন কি ফাইটটাই না দিয়েছে ওরা। এই তো সেবার এত ঢাক-ঢোল

বাজিয়ে চীনা অলিম্পিক টীম এল। ব্যস্, দু-দুটো গোল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল তাকে সোজা কানটি ধরে দেশে পাঠিয়ে দিলে।

তারপর সুইডেনের বিশ্ববিখ্যাত গোটেবার্গ টীম। তারাও ইস্টবেঙ্গলের পাল্লায় পড়ে পালাবার পথ পেল না।

এরপর খাস ইয়োরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে অষ্ট্রিয়ার ডাকসাইটে গ্রেজার অ্যাথলেটিক ক্লাবের সঙ্গে লড়াই। সেই গুণে গুণে দুই গোল।

তারপর মস্কোতে। একদিকে ইস্টবেঙ্গল, অন্যদিকে তাদের দুর্দান্ত টীম মস্কো টর্পেডো। সেখানেও ইস্টবেঙ্গল মার খেয়ে পাল্টা মার দিতে ছাড়েনি। খেয়েছে তিন গোল, দিয়েছে তিন গোল।

এসব কথা চিন্তা করতে গেলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল যে আমাদের দেশের সম্মান অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই!

—কইছেন ঠিকই। এবার মুখ খোলে বলাই, তবে প্যাদানের কথা যদি কন তো আমাগো ঢাকা। পয়লা প্যাদান যদি কেউ প্যাদাইয়া থাকে তো তারাই প্যাদাইছে।

—ওদের কথা ছেড়ে দে। নিজের জন্মভূমির কথা বলতে গিয়ে আত্মপ্রসাদে মনটা ভরে ওঠে মহাদেববাবুর, খেলার মাঠে ওরা যে কখন কি করে বসবে, তা অনুমান করা শিবেরও বুঝি অসাধ্য।

সেকালে বছরে একবার আই. এফ. এ শীল্ডে খেলতে এসে ওরা কি এখানকার নামী নামী টীমগুলোকে কম জ্বালিয়েছে! গোরাদের কম নাচিয়েছে!

তবে ভেল্কী দেখালে সাঁইত্রিশ সনে। সেবার বিলেতের সেরা টীম কোরিন্থিয়ান দল খেলতে এসে একে একে মোহনবাগান,

ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান আই. এফ এ. একাদশ, সবাইকে হারিয়ে তছনছ করে দিলে।

তারপর এল ঢাকার পালা। ব্যস্, যাকে বলে বাঙালের গোঁ। দিলে কোরিন্থিয়ানের মাথায় ঘোল ঢেলে।

জীবনে অনেক খেলা দেখেছি, কিন্তু সেদিন যা দেখেছিলাম কোথাও বুঝি তার তুলনা মেলেনা।

কি খেলাটাই না সেদিন খেলেছিল ঢাকার ছেলেরা। ট্রেনার বাঘা সোমের শিক্ষাধীনে থেকে কনু, রাখাল, জ্যোতিষ, রাম, যোগজীবন, সুবোধ, মন্টু, পরেশ, নিরোদ, ভূপেন, বি সেন, দীনেশ,—এক একটা যেন বাঘের মত রুখে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। প্রাণ যায় সেভি আচ্ছা, তবু দেশের সম্মান রাখতেই হবে।

রেখেছিল। সত্যিই ওরা রেখেছিল। ফুটবলের ইতিহাসে সেই হল আমাদের প্রথম জয়, যে খেলায় আমরা বিদেশী টীমকে পরাজিত করে সর্বপ্রথম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলাম। নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব ঢাকার ছেলেদের।

—হ, ভাইবা দেখতে গেলে বেবাক সমান। পরম দার্শনিক হয়ে ওঠে বলাই।

—নিশ্চয়! সমর্থন করেন মহাদেববাবু, এই তো আসল কথা। তাহলে সেবার কি হয়েছিল শোন।

উনিশশো একুশ সনের কথা।

একই দিনে আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা পড়েছে মোহনবাগান ভার্সাস ক্যালকাটা, অন্যদিকে বিরাশিটি-গোল-করা ও একটিও-গোল না-খাওয়া চাম্পিয়ন একাম্ন কেং আর. জি. এ. ভার্সাস ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল তখন যাকে বলে একেবারে শিশু টীম। মাত্র এক বছর আগে তার জন্ম হয়েছে।

—তারপর? কণ্ঠে ব্যগ্রতা ঝরে পড়ে মিতার।

—তারপর সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হেসে বললেন মহাদেববাবু, মোহনবাগান হেরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে এল এ মাঠে।

শুনেই রুখে দাঁড়াল ইস্টবেঙ্গল। ভেবেছ কি তোমরা! বড় ভাইকে তোমরা হারিয়ে দেবে, আর ছোট ভাই হয়ে আমরা তা সহ্য করব! কক্ষনো না। দাদার মর্যাদা আমরা রাখবই।

বাচ্চাগুলো সত্যই কথা রাখল। অমন দুর্ধর্ষ চাম্পিয়ন টীম, তাকে কিনা ওরা তিন-এক গোলে হারিয়ে ভূত করে দিলে? সুতরাং খেলার ব্যাপারে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। সব সমান।

কেউ ছোট নয়। কেউ বড় নয়। সব সমান।

রাত্রির এই স্বপ্ন দিনের আলোতে মিলিয়ে যেতে দেরি হল না। পুনরনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান হেরে গেল। শীল্ড পেল ইস্টবেঙ্গল।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে বোমার মত ফেটে পড়লেন মহাদেববাবু।

—খেলতে এসেছেন! জার্সি গায়ে দিয়ে বড় বড় সব খেলোয়াড় হয়েছেন! বলি হারতে যদি তোদের এতই সাধ হয়েছিল তো এরিয়ান্স, খিদিরপুর, বাটা, যে কারো কাছে হারলেই তো পারতিস। তা বলে ঐ—ঐ ইয়েদের কাছে! না, এখন খেলাধূলো ছেড়ে মাঠে গিয়ে চরে বেড়াগে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন মহাদেববাবু। ভাগ্যিস মোহনবাগানের কোন খেলোয়াড় তখন সামনে ছিল না। থাকলে কি হত বলা শক্ত।

—কি গো মোহনবাগানের মেয়ে। মিতাকে একা পেয়ে এবার হেসে বলল সুবিনয়, পারলে তোমার ইস্টবেঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখতে ?

—খুব ফুর্তি যে ! চোখ পাকিয়ে বলল মিতা।

—কেন হবে না ? একশো বার হবে। কেন, তোমার হয়নি ?

—জানিনে বাপু। হঠাৎ মুখটা ম্লান হয়ে গেল মিতার, জানো, বাবার জন্য মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে। যাই, দেখে আসিগে।

অসময়ে মিতাকে আসতে দেখেই সস্নেহে আহ্বান জানালেন মহাদেববাবু। —কে ? বৌমা ? এস মা, এস। তা, হঠাৎ এসময়ে যে ! কিছু বলবে আমাকে ?

—বলছিলাম—বলছিলাম যে খেলায় হার-জিৎ আছেই। কুণ্ঠিত নতমুখে বলল মিতা, আপনি তার জন্য কোন দুঃখ করবেন না বাবা।

—কি বলছ মা। বড় দুঃখের এক মর্মরাঙা হাসি ফুটে উঠল মহাদেববাবুর সারামুখে, দুঃখ পেতে না চাইলেই কি কেউ কোনদিন তাকে এড়াতে পারে।

সেই কবেকার কথা। বাবার হাত ধরে মাঠে যেতাম মোহনবাগানের খেলা দেখতে। পরে একাই যেতে শিখলাম। তার জন্য স্কুল-কলেজ-অফিস কত যে কামাই করেছি তা বোধহয় গোণাগুন্তি নেই। কষ্ট হয়তো তাতে হয়েছে, তবে মনও ভরেছে।

কত খেলাই না দেখেছি জীবনে।

ডালহৌসী, ক্যালকাটা, ডারহামস, ব্ল্যাকওয়াচ, গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স, আর. জি. এ. ক্যামেরন্স রেঞ্জার্স, রাইফেল ব্রিগেড উইয়র্ক, কত বড় বড় সব টীম। এখনো ছবির মত সব মনে পড়ে

তারপর একদিন চাকরি-জীবন থেকে অবসর নিলাম। অবসর নিলাম খেলার মাঠ থেকেও।

তবু শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের স্বপ্ন মোহনবাগানের স্মৃতি এতটুকুও ম্লান হল না। সে স্মৃতি আজও তেমনি উজ্জ্বল। তেমনি মধুর।

তাই মোহনবাগানের নাম শুনলে মনটা আজও নেচে ওঠে বৌমা। মনে হয় আমি যেন সেই আগেকার দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছি।

হয়তো এটাকে তোমার পাগলামো বলে মনে হতে পারে, কিন্তু খুঁজে দেখলে এই কলকাতা শহরে আমার মত এমনি অসংখ্য পাগলের সন্ধান পাবে, যারা আজো দূর থেকে মোহনবাগানকে এমনি ভালবাসে, মোহনবাগানের সামান্য পরাজয়ে এমনি উতলা হয়ে পড়ে।

কেন এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা? কোথায় এর রহস্য?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফিরে যেতে হবে বৌমা।

তখন আমরা পরাধীন। আমাদের একমাত্র স্থান তখন ইংরেজের বুটের তলায়।

ওদিকে কলকাতায় তখন ফুটবলের প্লাবন চলছে। বাঘা বাঘা সব টীম আসর জাঁকিয়ে বসেছে কলকাতার ময়দানে।

কিন্তু সবই গোরাদের। দেশীয়দের সেখানে কোন স্থান নেই।

সেদিন পাড়ার কয়েকটি ছেলে শ্যামবাজারের 'মোহনভিলা' বাড়িতে জড় হল।

ইতিমধ্যেই আশে-পাশে শোভাবাজার, কুমারটুলী, ন্যাশনাল, টাউন, হেয়ার স্পোর্টিং ইত্যাদি কয়েকটি দেশীয় ক্লাবের সৃ হয়েছে। সুতরাং আমরাও ক্লাব করব, ফুটবল খেলব।

এগিয়ে এলেন স্থানীয় বিপ্রকুটিরের দ্বিজদাস ভাদুড়ী ও রামদাস ভাদুড়ী। এগিয়ে এলেন ভূপেন বোসের বাড়ির ছেলেরা। কর তোমরা ক্লাব, আমরা পেছনে আছি।

মোহনবাগান ভিলায় নামানুসারে ক্লাবের নাম রাখা হল মোহনবাগান ক্লাব। সভাপতি ভূপেন বোস, আর সম্পাদক হলেন যতীন্দ্রনাথ বোস।

এপাড়া ওপাড়ায় খেলে কেটে গেল দুবছর।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে। ইতিমধ্যে ক্লাব বড় হয়ে গেছে। এবার বড় মাঠ চাই যে।

সুতরাং চল এবার শ্যামপুকুর পার্কে। পেছনে যখন রাজা দুর্গাদাস লাহার মত পৃষ্ঠপোষক রয়ে গেছেন, তখন ভাবনা কি।

তখন মোহনবাগানের পক্ষে কে কে খেলতেন জান বৌমা?

গোলে ছিলেন প্রবোধ দাস, ব্যাক গিরীশ ঘোষ আর অন্নদা দাস। হাফব্যাক প্রফুল্ল রায়, ডোঙা দত্ত, ক্ষিতীশ সিংহ ও ভোলা ঘোষ, আর ফরোয়ার্ড ছিলেন চার ভাই—রামদাস, দ্বিজদাস, বিজয়দাস ও শিবদাস ভাদুড়ী, আর ছিলেন অর্ধেন্দু বোস ও দ্বিজেন বোস।

তাতেও মন উঠল না শোভাবাজার, ন্যাশনাল ওদের মত নিজস্ব মাঠ চাই।

কিন্তু চাইলেই তো হল না। মাঠ কোথায়?

শেষ পর্যন্ত উনিশশো সনে ভাগীদার হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠ। সবাই খুশি। হোক ভাগীদার তবু মাঠ তো।

কিন্তু এভাবে নিজেদের মধ্যে কত আর খেলা যায়। ঐ গোরাদের সঙ্গে কি একবার খেলা যায় না? ওদের হারানো যায় না?

সুযোগ পাওয়া গেল উনিশশো পাঁচ সনে চুঁচুড়ায়।

গ্ল্যাডস্টোন কাপের ফাইনাল। একদিকে সে-বছরের আই এফ. এ. শীল্ড-বিজয়ী ডালহৌসী, অন্যদিকে মোহনবাগান। ট্রেনে দেখা। মোহনবাগান দল অবাক। একি! ওরা সাতজন কেন! বাকী চার জন কোথায়।

উত্তরে ওরা কি বলল জান বৌমা? বলল—মোহনবাগানের মত কোথাকার একটা নেটিভ টীমের সঙ্গে খেলতে হলে সাত জনই নাকি যথেষ্ট।

বটে। অপমানে কালো হয়ে উঠল মোহনবাগানের মুখ। এই কথা!

ঠিক আছে। এর জবাব দেব খেলার মাঠে ভেল্কীর রাজা শিবদাস তো সঙ্গেই আছে। দেখা যাবে তখন।

মুখে বড়াই করলেও খেলার মাঠে কিন্তু ওদের সেই নিয়মিত এগারো জনকেই দেখা গেল। বোঝা গেল ট্রেনে না এসে বাকী চারজন এসেছে অন্য পথে। খেলার প্রথম মিনিটেই ভেল্কী দেখাল শিবদাস। পরিষ্কার গোল। তিন মিনিট বাদে ভোঙা দত্তর কাছ থেকে বল পেয়ে আবার সেই ভেল্কী। আবার গোল। তারপর শুধু গোল, গোল আর গোল। শেষ পর্যন্ত ছয়-এক গোলে জয়ী হল মোহনবাগান।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল চারিদিকে।

বলে কি! শীল্ড-বিজয়ী অমন দুর্ধর্ষ টীমকে কিনা হারিয়ে দিলে বাংলাদেশের গুটি কয়েক ছেলে। সাবাশ! হাজার সাবাশ তোমাদের।

এর পর সাহস করে মোহনবাগান আই. এফ. এ. শীল্ডে নাম দিল উনিশশো আট সনে। অর্থাৎ মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার।

প্রথম খেলা শক্তিশালী ওয়াই. এম. সি. এ. দলের সঙ্গে। জ

হল মোহনবাগান। পরের খেলা দুর্দান্ত গোরা টীম গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্সের সঙ্গে।

সে কি বৃষ্টি সেদিন! এই বৃষ্টির জন্মই সেদিন মোহনবাগানকে হার স্বীকার করতে হল তিন শূন্য গোলে। ঝড়-জলের মধ্যে খালি পায়ে বুটের বিরুদ্ধে কতক্ষণ আর লড়াই চালানো যায়।

মনে মনে বলল মোহনবাগান, শুকনো মাঠে ওদের কি কোনদিন পাব না! সেদিন এর জবাব দেব।

সুযোগ পাওয়া গেল লক্ষ্মীবিলাস কাপ ফাইনালে। বিপক্ষে সেই গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স। এবার এস বাছাধন।

সে কি খেলা বৌমা! একদিকে মোহনবাগান তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পূর্ব পরাজয়ের জবাব তাকে দিতেই হবে।

অন্য দিকে গোরাদলও নাছোড়বান্দা। প্রাণ যায় সেভি আচ্ছা, তবু নেটিভ দলের কাছে তারা কোনমতেই হারতে রাজী নয়।

পর পর পাঁচ দিন ড্র। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়।

মীমাংসা হল ষষ্ঠ দিনে। হঠাৎ হাবুল সরকারের পায়ে বল পড়তেই ম্যাজিক ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোল।

তারপর সে এক মজার কাণ্ড বৌমা। গোরার দল ক্ষেপে লাল। কিছুতেই তারা নেটিভ দলকে কাপ নিতে দেবে না।

কাজেও তাই করলে। হঠাৎ তারা মোহনবাগানের হাত থেকে কাপ ছিনিয়ে নিয়ে কেল্লার দিকে সোজা দৌড়।

অবশ্য পরদিন তারা লক্ষ্মীছেলের মত মোহনবাগানকে কাপ ফিরিয়ে দিয়েছিল।

বাংলার দিকে দিকে তখন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত।

সবার মুখে একই কথা। সবার মুখে একটি মাত্র নাম—

মোহনবাগান! মোহনবাগান! মোহনবাগান! বাঙালীর কাছে মোহনবাগানের চাইতে প্রিয় বুঝি সেদিন কেউ ছিল না।

অবশ্য তার কারণও ছিল। বিদেশী শক্তির চাপে সেদিন বাংলার চেতনা ছিল সুপ্ত, ঘুমন্ত।

হঠাৎ ঝড় এল। মাত্র দুবছর আগে সেই ঘুমন্ত সত্তাকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গেল শহীদ ক্ষুদিরাম।

তারপর মিছিলের মত সারি দিয়ে এল মাণিকতলা বোমার মামলা, আলীপুর জেলে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা, ফাঁসী কাঠে কানাই, সত্যেনের আত্মবিসর্জন, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের দ্বীপান্তর দণ্ড ইত্যাদি রক্তচঞ্চল করা সব অভাবনীয় ঘটনা।

স্বভাবতঃই বাঙালী তখন ক্ষুব্ধ, অপমানিত। বুকে তাদের অসন্তোষের আগুন, কিন্তু মুখে কোন প্রতিবাদ নেই, প্রতিবাদ জানানোর মত ভাষাও তাদের জানা নেই। সে সাহসও নেই। অধিকারও নেই।

ওরা যে রাজার জাত। আমাদের ভাগ্যবিধাতা। সুতরাং ওরা যাই করুক না কেন, আমরা তা নিঃশব্দে মেনে নিতে বাধ্য।

জাতীয় জীবনের সেই চরম অবমাননার দিনে দুর্বার বেগে এগিয়ে এল মোহনবাগান।

মোহনবাগানের মধ্য দিয়েই তখন মূর্ত হয়ে উঠল পরাধীন জাতির একমাত্র কামনা, আমরা মুক্তি চাই। তোমাদের নাগপাশ থেকে আমরা মুক্তি চাই।

আমরা ভীরু নই। দুর্বল নই। প্রমাণ আমাদের মোহনবাগান! পাঞ্জা লড়তে চাও! এসো তাহলে।

অবশেষে এল উনিশশো এগারো সনের সেই শীল্ড-বিজয়ের

অবিস্মরণীয় কাহিনী, যে কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

প্রথম খেলায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ঝড়ের মত উড়ে গেল তিন গোল খেয়ে।

পরের খেলা রেঞ্জার্সের সঙ্গে। হাফ-টাইমের আগেই দু-গোলে এগিয়ে গেল মোহনবাগান। তারপরই শুরু হল সেই সর্বনেশে বৃষ্টি। ফলে তিন তিনটে পেনাল্টি পেল রেঞ্জার্স।

বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন গোলকীপার হীরালাল মুখার্জী। তিনটে কেন, যত খুশি ইচ্ছে তোমরা পেনাল্টি দাও, তা বলে বল আমি কিছুতেই গোলে ঢুকতে দিচ্ছিনে।

আশ্চর্য, কাজেও তাই করলেন। সব ক'টা বলই তিনি ফিরিয়ে দিলেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে। আজকের দিনে এমন কথা বোধহয় চিন্তাও করা যায় না।

এবার মুখোমুখি হল রাইফেল্স ব্রিগেড দল। যাকে বলে দারুণ টীম। খেলেও ছিল ভাল।

কিন্তু ভাল খেললে কি হবে। ওদের ভাষায় সেই 'স্লিপারী শিবদাস'কে রুখবে কে। তার পায়ে বল পড়া মানেই তো গোল।

ঠিক তাই হল। এক ফাঁকে তিনিই টুক করে একটি গোল দিয়ে দিলেন রাইফেল ব্রিগেড দলকে।

এবার এল মিডলসেক্স দল। চমৎকার খেললে সেদিন মোহনবাগান।

কিন্তু সব বৃথা। বিপক্ষের গোলে দাঁড়িয়ে তখনকার দিনের বিখ্যাত গোলকীপার পিগট্।

কার সাধ্য সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করে! সে অটল, অনড়। বরং পাহাড় টলানো সম্ভব, কিন্তু পিগট্‌কে কোনমতেই নয়।"

পরদিন সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করলেন অভিলাষ ঘোষ। তিনিই সেদিন পিগট্‌কে বাধ্য করলেন মাথা নোয়াতে।

অবশেষে এল সেই অবিস্মরণীয় উনত্রিশে জুলাই।

সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য বৌমা। সকাল থেকে কাতারে কাতারে লোক চলেছে গড়ের মাঠের দিকে। হেঁটে, নৌকায়, ট্রেনে, যার যে ভাবে সুবিধে ছুটে আসছে শাসক ও শাসিতের এই মর্যাদার লড়াই দেখতে।

ওদিকে রাণাঘাট ও বর্ধমান পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত হয়েছে! তাতেও বোঝাই হয়ে আসছে বিস্তর লোক।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন পার্শী কেউ বাদ নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য গড়ের মাঠ। একমাত্র কামনা—মোহনবাগানের জয়, কারণ মোহনবাগান সেদিন শুধু মাত্র একটা দল নয়, সে পরাধীন জাতির আত্মার প্রতীক।

গোরার দলও পিছিয়ে নেই। কেল্লা ঝেঁটিয়ে সবাই এসেছে।

সঙ্গে এনেছে একটা কাগজের তৈরী শীল্ড। ইস্ট ইয়র্কের জয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তখন এই কাগজের শীল্ডটা দিয়েই নেটিভদের সঙ্গে তারা মজা করবে।

ওদিকে রাজেন সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, হীরালাল মুখার্জী, মনোমোহন ঘোষ, সুধীর চ্যাটার্জী, সুকুলবাবু, কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয় দাস ও শিবদাস ভাদুড়ীও প্রস্তুত।

সবার কপালে কালীঘাটের কালীমায়ের আশীর্বাদপূতঃ সিঁদুরের ফোঁটা। ধর্মের দিক থেকে খৃষ্টান হলেও সুধীর চ্যাটার্জীও কপালে সেই সিঁদুর ধারণ করেছেন পরমশ্রদ্ধাভরে।

কারণ ধর্মটা এখানে গৌণ। আসল লক্ষ্য হল বিদেশী শাসকদের উপযুক্ত জবাব দেয়া। সেখানে ধর্মের কোন স্থান নেই।

শুরু হল খেলা। সুন্দর মাঠ। আবহাওয়াও চমৎকার। সুতরাং মোহনবাগানের পক্ষে আক্রমণ চালাতে কোন অসুবিধে হল না।

অপর পক্ষও কম যায় না। সেকি চেহারা এক একটার। বল নিয়ে ক্ষ্যাপা মোষের মত যখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তেড়ে আসে তখন সে চেহারা সত্যই ভয়ঙ্কর। দেখলেও ভয় করে।

বেচারা শিবদাস। শুরু থেকেই সেদিন সে নজরবন্দী।

বিপক্ষ দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের নজর তার দিকে। ওকে বিশ্বাস নেই। ওর ঐ সরু কাঠির মত ঠ্যাং দুখানি নিয়ে ও যে কখন কোথায় পাঁকাল মাছের মত পিছলে ঢুকে পড়বে, কেউ তা বলতে পারে না। সুতরাং ওকে সামলে রাখাই ভাল।

হঠাৎ রেফারী পুলারের বাঁশি বেজে উঠল। বেঁটে রাজেন সেন নাকি হেড দেবার চেষ্টায় ইস্ট ইয়র্কের সেণ্টার হাফ জ্যাকসনের কাঁধে ভর করে লাফিয়ে উঠেছে। সুতরাং ফাউল। ফ্রী কীক্ করবে ইস্ট ইয়র্ক!

—সরে যাও সব। বুক চিতিয়ে বললেন গোলকীপার হীরালাল, তিন তিনটে পেনাল্টি যেখানে থামাতে পেরেছি, সেখানে এ তো একটা ফ্রি কীক মাত্র। সরো সবাই।

সবাই সরে গেলেন, গেলেন না শুধু ব্যাক সুকুলবাবু। ভয়, পাছে কোন অঘটন ঘটে যায়।

হায় ভগবান! জ্যাকসনের সেই ফ্রি কীক্, লাগবি তো লাগ সুকুলবাবুরই গায়ে, তারপরই ঠিকরে চলে গেল গোলের ভেতরে। হীরালাল প্রস্তুত হবার কোন সুযোগই পেলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কাগজের শীল্ড তুলে ধরে গোরাদের সে কি উন্মত্ত উল্লাস! সে কি নৃত্যভঙ্গিমা।

বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চেয়েছিলি,—এবার শিক্ষা হল

তো। নেটিভ হয়ে আর কোনদিন খেলতে আসবি আমাদের সঙ্গে। এই নে কাগজের শীল্ড।

আবার খেলা শুরু হল হাফ-টাইমের পরে। মোহনবাগান এবার মরীয়া। অপমানের যোগ্য উত্তর দিতে হবে; ওদের এ দম্ভকে একেবারে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।

একই কথার অনুরণন চলছে তখন উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকের মনে.

তোমরা জবাব দাও। সারা দেশ আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরা উপযুক্ত জবাব দাও। শিবদাস, তোমার ভেল্কী দেখাও।

খেলা শেষ হতে আর ছ' মিনিট মাত্র বাকী। হঠাৎ ভেল্কী দেখালেন শিবদাস।

ব্যাপার ভারি মজার বোমা। দুইভাই বিজয়দাস আর শিবদাস দেখতে ছিলেন অনেকটা একই রকম। ইশারায় কখন যে জায়গা তারা বদল করে একে অন্যের জায়গায় চলে গেলেন, গোরার দল তা টেরই পেল না।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ভানুমতীর খেল্।

কি যে হল কিছুই বোঝা গেল না, শুধু দেখা গেল দুখানি কাঠির মত সরু ঠ্যাং সবাইকে কাটিয়ে পাঁই পাঁই করে গোলের দিকে ছুটছে।

তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই শোনা গেল হাজার হাজার লোকের উন্মত্ত চীৎকার—গোল! গোল! গোল।

বিপক্ষের গোলকীপার ক্রেসী হতভম্ব।

একি আশ্চর্য ব্যাপার। বলটা এখানে কি করে এল। এলই বা কোন পথে। তবে কি সত্যই ইণ্ডিয়ানরা ভেল্কী জানে।

সারা মাঠে তখন সে কি উত্তেজনা। দর্শকদের সে কি দিগন্ত-ফাটানো চিৎকার।

আর একটা চাই ভাই শিবদাস, আর মাত্র একটা। সোনা দিয়ে তোমার পা মুড়ে দেব।

অবশেষে এল সেই পরম লগ্ন। খেলা শেষ হতে আর দু-মিনিট মাত্র বাকি। হঠাৎ আবার বল এসে গেল শিবদাসের পায়ে।

কিন্তু না, চালাকী বুঝতে পেরে বিপক্ষ দল আবার তার চারপাশে সতর্ক পাহারা বসিয়েছে। সুতরাং মুহূর্ত দেরি না করে তিনি বল ঠেলে দিলেন অভিলাষের দিকে।

এতটুকু ভুল করলেন না অভিলাষ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বল নিয়ে নিজেও ঢুকে পড়লেন গোরাদলের গোলের ভেতরে।

মাঠে তখনকার অবস্থা তোমাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না বৌমা।

হাজার হাজার কণ্ঠে সে কি উল্লাসধ্বনি। দিকে দিকে সে কি আনন্দ-কোলাহল।

কেউ কেউ তো কেঁদেই ফেললেন আনন্দের আতিশয্যে। এ জয় শুধু মোহনবাগানের জয় নয়, এ জয় নির্মম রথচক্রে পিষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষের। এ জয় ভারতের, এ জয় সমগ্র জাতির।

খেলা শেষ, তা বলে দর্শকের আনন্দ-উল্লাস সেখানেই শেষ হল না।

একদল তেড়ে গেল গোরাদের দিকে। খুব তো তখন কাগজের শীল্ড দেখিয়েছিলি। এবার ঐ শীল্ড তোদের গলায় ঝুলিয়ে ছাড়ব। দাঁড়া মজাটা দেখাচ্ছি।

মজা কিন্তু উল্টে গোরারাই দেখাল বৌমা। সে কি দৌড়। যেদিকে তাকানো যায় শুধু দৌড়—দৌড়—আর দৌড়। এক দৌড়ে কেল্লার ভেতরে ঢুকে তবে তাদের স্বস্তি।

৫

এবার শীল্ড বিতরণের পালা, কিন্তু কার সাধ্য সামনে এগোয়। মাঠে যত লোক, তার বিশগুণ লোক বাইরে। সবাই চায় তাদের জাতীয় বীরদের একটু দেখতে।

ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই তখন কাছে এগোতে পারলেন না জনতার চাপে। রাজেন সেন তো অজ্ঞানই হয়ে গেলেন শেষপর্যন্ত।

সেদিনের সেই চরম জয়কে কেন্দ্র করে কত অবিস্মরণীয় ঘটনা। কত অবিশ্বাস্য কাহিনী। ভুলতে চাইলেও বুঝি তাকে ভোলা যায় না।

তার মধ্যে শুধু একটি ঘটনার কথাই তোমাকে বলব বৌমা।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়! ভীড় কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে। খেলোয়াড়রা বেরিয়ে আসছেন একে একে।

হঠাৎ কোথা থেকে এগিয়ে এলেন শুভ্র উপবীতধারী এক বৃদ্ধ, কেল্লাশীর্ষের ইউনিয়ন জ্যাকটাকে দেখিয়ে তিনি সুধীর চ্যাটার্জীর মাথায় হাত রেখে বললেন—বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে তোমাকে আশীর্বাদ করছি বাবা। আজ শীল্ড জয় করেছ, এবার ওটাকে কবে জয় করবে বল! কি, পারবে না?

—পারব। সম্ভ্রমভরে জবাব দিলেন সুধীর চ্যাটার্জী।

—হ্যাঁ পারবে। আনন্দে চোখে জল এসে গেল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের, নিশ্চয় পারবে। সবে তো যাত্রা শুরু। এবার দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে যাও। কথাটা মিথ্যে নয় বৌমা। পরাধীন জাতির গণচেতনার মূলে সেদিন এই মোহনবাগান যে ভূমিকা নিয়েছিল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও বোধকরি কোনদিন তা পারে নি।

এ শুধু আমার কথা নয়, বিদেশী সংবাদপত্রগুলো পর্যন্ত এ চরম সত্যকে সেদিন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে।

রয়টার বললেন : ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এক ভারতীয় দল মোহনবাগান তুখোর বৃটিশ ফৌজী দলগুলিকে হারিয়ে আই. এফ. এ. শীল্ডে জয়লাভ করেছে। ইস্টইয়র্ক পরাজিত হবার পরে যে দৃশ্য দেখা গেছে তা কল্পনাতীত।

স্টেটসম্যানের অভিমত : যোগ্য দলই জয়ী হয়েছে। পল্টনী খেলোয়াড়দের সবকিছু ব্যর্থ হয়েছে বাঙালীদের কৌশলী খেলার কাছে।

লণ্ডনের ডেইলি মেল : শ্রেষ্ঠ বৃটিশ ফৌজী দলের বিরুদ্ধে বাঙালীদের এই জয় এক স্মরণীয় ঘটনা।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান : যে দলের দৈহিক পটুতা, দৃষ্টির প্রখরতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বেশি, জয় তাদের অনিবার্য। সুতরাং বাঙালীদের এই জয়ে অবাক হবার কিছু নেই।

সিঙ্গাপুর ফ্রি'প্রেস : দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান দানবের মত খেলেছে। কম করে হলেও লাখ খানেক লোক জমায়েত হয়েছিল। অনেকেই দেখতে পায়নি, তবু জনতার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়নি।

ইংরেজ পত্রিকা এম্পায়ার : মোহনবাগানের এগারো জন খেলোয়াড় কলকাতার মুখ রক্ষা করেছে। ওরা ফুটবলের গৌরব স্বরূপ।

মৌলানা মহম্মদ আলীর 'কমরেড', সুরেন ব্যানার্জীর 'বেঙ্গলী' ইত্যাদি দেশীয় কাগজগুলোও পিছিয়ে রইল না।

অমৃতবাজার লিখলেন : অমর এগারো জন।

মুসলীম সমাজের মুখপাত্র সাপ্তাহিক মুসলীম লিখলেন : হিন্দু ভাইদের জয়ের সংবাদে মোসলেম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যগণ আনন্দে ডিগবাজী খেতে থাকে।

তবে চরম সত্য ব্যক্ত করলেন খাস ইংরেজ মুখপাত্র ইংলিশ-

ম্যান! তারা স্পষ্টই লিখলেন—কংগ্রেস ও স্বদেশীওয়ালারা এতদিনের চেষ্টায় যা পারেনি, মোহনবাগান আজ তা পেরেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনার প্রধান সংহতিকেন্দ্র আজ মোহনবাগান।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুধু জেগে আছে সুবিনয়। মিতা এখনো আসেনি। তবে তার আসার সময় হয়েছে।

পরিপূর্ণ এই নিটোল অবকাশ মুহূর্তে রোজই তারা সারাদিনের সঞ্চিত আবেগ মুক্ত করে দেয় একে অন্যের কাছে। সম্পূর্ণ তুজনের বাসনা-কামনা দিয়ে গড়া এ যেন একটা আলাদা জগৎ।

আজ মিতাকে একটু দেরী করে ঘরে ঢুকতে দেখে রহস্য করে বলল সুবিনয়,—কি গো মোহনবাগানের মেয়ে এত দেরী যে আজ।

—বাবার কাছে গল্প শুনছিলাম। মিষ্টি করে হাসল মিতা।

—মোহনবাগানের গল্প নিশ্চয়ই! সুবিনয়ের সারামুখে কৌতুক।

—তা ঠিক। তবে শোনার মত কাহিনীই বটে। স্বীকার কর আর নাই কর, সেদিন কিন্তু ওরা সত্যই অসাধ্য সাধন করেছিল।

—অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। হেসে বলল সুবিনয়, কারণ ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না।

—তার মানে! সকৌতুকে বলল মিতা, মনে মনে তাহলে তুমি ওদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর, বল?

—মুখেও করি। আমি কেন, সবাই করে। প্রতিটি খেলোয়াড়ই করে।

—কি আশ্চর্য! মিতা অবাক, তাহলে দুপক্ষে এই রেষারেষি কেন?

প্রয়োজনের তাগিদে। কারণ রেষারেষি যেদিন থাকবে না, সেদিন খেলার মান বলতেও কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে উভয়েই আজ উভয়ের সব চাইতে বড় বন্ধু।

—তাহলে আসল দ্বন্দ্বটা কোথায়? প্রশ্ন করল মিতা।

– দ্বন্দ্ব! হেসে বলল সুবিনয়—এটা পূব পশ্চিমের দ্বন্দ্ব নয়, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলও নয়। আসলে এটা হল সেই চিরাচরিত প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব।

নবীনের দাবী—তাকে সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু কোথায় সুযোগ। সর্বত্রই প্রবীণের ভীড়। সর্বত্র এক রব—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। খেলোয়াড় বেড়েছে তা বলে দল তো আর বাড়েনি।

নবীন তখন কোথায় যাবে! পিছিয়ে যাবে! হেরে যাবে!

অসম্ভব। খেলার ব্যাপারে তারুণ্যের শক্তিরই যে সর্বত্র জয়-জয়কার! সুতরাং তাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে! দরকার হলে তার জন্য নতুন দল গড়তে হবে।

এই মনোভাব থেকেই উনিশ'শ বিশ সনের এক শুভলগ্নে এগিয়ে এলেন জোড়াবাগানের সুরেশ চৌধুরী, কুমারটুলীর তড়িৎ রায় আর উয়াড়ীর খেলোয়াড় নসা সেন।

আর এলেন বনোয়ারীলাল রায় ও জীতু মুখার্জী। তারপর একে একে এলেন কপি ঘোষ ও জ্যোতিষ গুহ।

এই হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

—তার মানে প্রবীণদের কোনরকম সহযোগিতাই কি তোমরা চাও না? প্রশ্ন করল মিতা।

—চাই বৈকি! হেসে জবাব দিল সুবিনয়, উপদেষ্টা হিসাবে তাদের সহযোগিতা আমরা অবশ্যই চাই, কিন্তু খেলার ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি তারুণ্যের শক্তিতে আস্থাশীল।

প্রমাণ উনিশ শ' একচল্লিশ সন। সে বছর আমরা দল থেকে একমাত্র পি, দাশগুপ্ত, সুনীল ঘোষ, আপ্পারাও, আর সোমানা বাদে বাকী সমস্ত খেলোয়াড়দের বিদায় দিয়ে দিলাম। কারণ আমরা নতুন রক্ত চাই। নতুন মুখ।

—তার ফল যে কি দাঁড়াল সে তো তুমিও জান মিতা। একটু থেমেই আবার বলল সুবিনয়, সেই থেকে এই অল্পদিনের মধ্যে কি না করেছে ইস্টবেঙ্গল। লীগ, শীল্ড, জোড়ামুকুট, রোভার্স, ডুরাণ্ড—কি সে নিতে বাকী রেখেছে। বরং বয়েসের কথা চিন্তা করতে গেলে এ ব্যাপারে তার কৃতিত্বই যে সব চাইতে বেশি তা কে অস্বীকার করতে পারে।

এর মূলে রয়েছে সেই তারুণ্যের শক্তি। ভারতের একমাত্র দল হিসাবে ইংলণ্ডের ফুটবল বার্ষিকীতে স্বীকৃতি মিলেছে সেই একই কারণে।

—কি জানি বাপু। অত-শত বুঝিনে। তবে বাবার জন্য মনটা সত্যি খুব খারাপ লাগছে। মনে খুবই কষ্ট পেয়েছেন আজ।

—ইস্টবেঙ্গল হারলে আমিও পেতাম। হেসে বলল সুবিনয়, বোধহয় তুমিও পেতে কিছুটা। কি ঠিক বলিনি?

—উঁহু। দুষ্টুমী করে বলল মিতা,—আমি মোহনবাগানের মেয়ে।

—তাই বুঝি ? সুবিনয়ের সারামুখে রহস্যময় হাসি—তাহলে হার স্বীকার কর ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

—কক্ষনো না। মোহনবাগান কোনদিনও কারো কাছে হার স্বীকার করে না।

—বটে! খানিকটা এগিয়ে গেল সুবিনয়—বেশ, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাক্।

—ভাল হবে না বলছি। মিষ্টি হেসে কয়েক পা পিছিয়ে গেল মিতা—অসভ্য কোথাকার!

কথাটা বলেই হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা অফ করে দিল মিতা। আর কোন প্রশ্ন নয়, কোন উত্তরও নয়। দুজনের সব প্রশ্ন, সব উত্তর হারিয়ে গেল মৌন রাতের অন্ধকারে।

•

পঁয়ষট্টি শেষ হল। এল উনিশ শ' ছেষট্টি সন। শুরু হল খেলোয়াড়দের দল বদলের পালা।

সবার মনে একটা চাপা উদ্বেগ। পুরনো ক্লাবের মায়া কাটিয়ে কে কোথায় ছিটকে চলে যাবে কে জানে।

অবশেষে একদিন প্রতীক্ষার শেষ হল।

দেখা গেল এ ব্যাপারে মোহনবাগানের লাভের অঙ্কটাই সব চাইতে বেশী। তারা ইস্টবেঙ্গলের খ্যাতনামা তিন জন খেলোয়াড়কে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে নিজেদের দলে।

আর ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে জুটেছে তাদের একজন মাত্র।

খবর শুনে মহাদেববাবু আনন্দে আত্মহারা। ছেলেকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বললেন—যাক, নিশ্চিন্ত। পর পর চারবার লীগ নিয়েছি। এবার নিয়ে পাঁচ বার হবে। মহামেডানের সমান রেকর্ড।

—পার তো নিও। অপ্রসন্ন কণ্ঠে মন্তব্য করল সুবিনয়।

—পার তো নিও মানে? এবার ছেলেকে সোজাসুজি আক্রমণ করলেন মহাদেববাবু,—আলবৎ নেব! পারলি কাউকে ধরে রাখতে। প্রসাদ, অসীম, সিন্‌হা, সব তো আমাদের দলে চলে এসেছে।

—দরকার থাকলে বাকী ক'জনকেও নিতে পার। জবাব দিল সুবিনয়।

—একথার মানে? ভ্রূকুটি করে তাকালেন মহাদেববাবু।

—মানে আবার কি? স্পষ্ট দৃঢ়স্বরে জবাব দিল সুবিনয়,—বরাবর তোমরা আমাদের খেলোয়াড় নিয়ে নিজেদের মুখরক্ষা করে এসেছ, এবারও তাই করেছ। এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে?

—খুব যে মুখ নেড়ে কথা বলছিস। তেড়ে উঠলেন মহাদেববাবু—কেন, তোরা নিসনি? নিসনি আমাদের প্লেয়ার দেবনাথকে?

—তোমাদের দরকার ছিল না বলেই নিয়েছি, থাকলে নিতাম না। কারণ কে গেল, কে রইল তা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কোনদিনও মাথা ঘামায় না। সে প্রমাণ তারা অনেকবারই দিয়েছে।

—আর মোহনবাগান বুঝি তার প্রমাণ দেয়নি? ঠিক আছে, শ্বাস্নান তো এসেই গেছে। এবার হাতে হাতেই তার প্রমাণ পাবি।

—তোমরাও পাবে। সতেজে জবাব দিল সুবিনয়, আমাদেরও গুরুকৃপাল, নঈম, হাবিব, শর্মা—সব্বাই এসে গেছে।

—আইছে ভাল করছে। মাঝ থেকে ফুট কাটল বলাই,—তবে খোপে টিকলে হয়।

—তার মানে? সক্রোধে ফিরে তাকাল সুবিনয়।

—মানে রেশনের চাউল প্যাটে পড়লেই টের পাইব। বলাই নির্বিকার, খেলা ছাইড়া তখন দৌড়াইয়া কূল পাইব না।

—ঠিক বলেছিস। হা-হা করে হেসে উঠে নিমেষেই পরিবেশটাকে হালকা করে দিলেন মহাদেববাবু, খুব খাঁটি কথা বলেছিস।

শুধু শুধু আমরা এখানকার খেলোয়াড়দের দোষ দিই, কিন্তু ওদের কথাটা কি একবারও কেউ ভেবে দেখেছি।

খেলতে হলে ভাল খাওয়া চাই। স্বাস্থ্য চাই। একবেলা আধপেটা দুটো ভাত, অন্যবেলা শুকনো দুখানি আটার রুটি, এই খেয়ে কি আর খেলা হয়।

তাছাড়া বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে কেউ আসবেন দমদম থেকে, কেউ বা যাদবপুর থেকে। তারপরই মাঠে একটানা সত্তর মিনিট ধরে এই হাড়ভাঙা মেহনত। এ কি মানুষের পক্ষে সম্ভব! বললেই তো হল না।

—ন্যেয্য কথা কইছেন দাদু। পরম দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল বলাই, এই দুঃখেই তো আমি খেলোয়াড় হইলাম না।

—বেশ করেছিস না হয়ে। বললেন মহাদেববাবু, একি চাট্টিখানি কথা! অথচ অন্য সমস্ত দেশে খেলোয়াড়দের কত কদর! কত সম্মান!

সেদিনের নতুন দেশ ইজরাইলের কথাই ধর। দু-তিনটি ছেলেকে টোকিও অলিম্পিকে যেতে হবে বলে গোটা ইউনিভার্সিটি তাদের সমস্ত পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে।

আমাদের দেশে এমন কথা ভাবতে পারে কেউ? নইলে তেমন সুযোগ পেলে আমাদের দেশের চুনী, জার্নাল, অরুময়, অশোক, নেত্য, অসীম, প্রসাদের মত ছেলেরা অসাধ্য সাধন করতে পারত।

—তা পারত। বৈষ্ণবোচিত বিনয় ফুটে উঠল বলাইয়ের

কণ্ঠে, তবে এই লগে আর কয়টা নাম কইলে হইত না ? যেমন—দেবনাথ, সুকুমার, পরিমল, চন্দন, শান্ত, প্রশান্ত—

—তা-তা বলতে চাস তো বলতে পারিস। আমতা আমতা করে বললেন মহাদেববাবু, তবে মোহনবাগানের খেলোয়াড়—

—জাতে কুলীন। একগাল হেসে বলল বলাই,—কি, ঠিক কই নাই দাদু ?

—যত্তো সব ! একরকম রাগ করেই উঠে গেলেন মহাদেববাবু। যত নষ্টের গোড়া হল এই বলাইটা। যাকে বলে দু-মুখো সাপ। কখন যে কোন দলে ঝুঁকে পড়বে বোঝা শক্ত। ওকে বিশ্বাস করাও দায়।

তখনকার মত মিটে গেলেও ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। সেদিন আরও রহস্য অপেক্ষা করে ছিল মহাদেববাবুর অদৃষ্টে।

সেই রহস্যের অবগুণ্ঠন খুললেন স্বর্ণময়ী দেবী। হাসতে হাসতে তিনি একসময়ে স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন,—খবর শুনেছ, তোমার যে নাতি হবে গো !

—এ্যাঁ। লাফিয়ে উঠলেন মহাদেববাবু। নাতি ! দাদুভাই ! কি আশ্চর্য ! আগে বলবে তো।

—আগে জানলে তো বলব। কটাক্ষ করে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, যা চাপা মেয়ে, সহজে কি বলতে চায়, অনেক করে ধরতে তবে স্বীকার করলে।

—দেখ দেখি কাণ্ড। সে যাকগে। তা আমি বলছিলাম কি বড়বৌ, খবরটা যখন জানাই গেলে, তখন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে আছে, ডেকে এনে একদিন বরং একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক। কি বল ?

—তা বেশ তো। সমর্থন জানালেন স্বর্ণময়ী দেবী!

তাহলে আমি বরং সেই ব্যবস্থাই করি। আর হ্যাঁ, দাছু-ভাইয়ের নাম রাখব আমি চুনী। আমাদের মোহনবাগানের চুনী।

—কক্ষনো না। পাশের ঘরের বলাইকে উপলক্ষ্য করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল সুবিনয়—ছেলের নাম হবে পরিমল। পরিমল দে'র নামে নাম।

—রেখে দেখুক না একবার ঐ নাম। খেঁকিয়ে উঠলেন মহাদেববাবু, সেদিন ওরই একদিন কি আমারই একদিন।

—খুব হয়েছে। স্বামীকে মুখঝামটা দিয়ে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, এবার চুপ কর।

—কেন চুপ করব? বাঁজখাই গলায় এবার আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন মহাদেববাবু, আমার দাছুভাইয়ের নাম আমি চুনী রাখব তাতে ওর—ওর বাপের কি। আলবৎ রাখব। একশবার রাখব। কেন রাখব না। পেয়েছে ওরা জন্মে কোনদিন পর পর চার বছর লীগ। আমরা পেয়েছি। এবারও পাব।

—দেবো না! হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল সুবিনয়, কিছুতেই দেবো না। জান কবুল, তবু মোহনবাগানকে এবার কিছুতেই লীগ নিতে দেবো না।

—তোর ঘাড় দেবে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাছে এগিয়ে এলেন মহাদেববাবু, তোর—তোর বাপ দেবে।

—বাবা! চীৎকার শুনে ছুটে এল মিতা, আপনি ঘরে চলুন বাবা। যে বোঝে না তার সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি। চলুন আমরা ঘরে যাই।

—সেই ভাল। যেতে যেতে বললেন মহাদেববাবু, আনাড়ীর সঙ্গে তর্ক করার চাইতে তোমার সঙ্গে গল্প করা অনেক ভাল। চল—

—চরম পত্র। দাদুকে চলে যেতে দেখেই ফুট কাটল বলাই।

—চরম পত্র? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুবিনয়। কিসের চরম পত্র?

—চরম পত্র না তো কি। বলাই নির্বিকার, একপক্ষ কয় যে—লীগ এইবার ছাড়ুম না—ছাড়ুম না—ছাড়ুম না। অন্যপক্ষ কয় যে—দিমু না—দিমু না—দিমু না। নাঃ। এইবার জমব ভাল। মনে হয়, সাপ্লাই বিজনেস থিকা দুইটা পয়সা পামু।

—পয়সা! সুবিনয় আবাক। খেলার সঙ্গে সাপ্লাইয়ের সম্পর্ক কি

—আমার সাপ্লাই তো খেলার মাঠেই। কথাটা ফস্ করে বেরিয়ে এল বলাইয়ের মুখ থেকে।

· খেলার মাঠে! বিস্ময়ের সীমা রইল না সুবিনয়ের।

—খাইছে! হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল বলাই, কথায় কথায় বেবাক গোমর তো ফাঁক কইরা দিছি।

—বাজে কথা রাখ। চেপে ধরল সুবিনয়, আমি জানতে চাই এসবের অর্থ কি। নিশ্চয়ই তুই খেলার মাঠে টিকেট ব্ল্যাক করিস?

—এইটা কি কইলেন বুট্টিমামা! প্রতিবাদ করে উঠল বলাই, প্যাটে বিদ্যা আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে, ঐসব আকাম করতে যামু কোন দুঃখে।

—তাহলে সব কথা খুলে বল। দৃঢ়স্বরে বলল সুবিনয়।

—শোনবেনই! কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল বলাই, বেশ তাইলে শোনেন। তবে কথা দেন যে কাউরে কইবেন না!

—বেশ, কথা দিলাম! এবার বল মাঠে কিসের বিজনেস করিস তুই? কি সাপ্লাই করিস?

—আধলা ইট। প্রায় কেঁদেই ফেলল বলাই।

—আধলা ইট! বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল সুবিনয়। এ কি অদ্ভুত কথা! মাঠে আধলা ইটের কি প্রয়োজন!

— আরে মর! বুকটান করে বলল বলাই, সাপ্লাই না করলে কামের সময় মাইন্‌সে এত ইট পায় কই! মাঠে তো আর ইট-খোলা নাই। তবে মিথ্যা কমু না কুট্টিমামা, পয়সা আছে। কতগুলি পোলাপান আছে, ওরাই ঝুড়ি প্রতি দুই পয়সা কইরা আইনা দেয়। আমি এক টাকা কইরা পাই। আর যদি কোনদিন জুইত মত লাইগা যায় তো সেদিন পাঁচ দশ টাকার পাত্তির কমে কথাই কই না। কি কমু কুট্টিমামা, আপনেগো দশজনের আশীর্বাদে মাল আমার কোনদিনও পইড়া থাকে না। ক্যাপিটেল কম, নইলে ভাইবা রাখছি এই লগে ছিড়া জুতা আর ভাঙা ছাতি সাপ্লাইয়ের জন্য একটা সাইড বিজনেস খুইলা ফালামু।

কথা শুনে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল সুবিনয়। ছেলে বটে বলাই। মাথায় ওর কত কিই না খেলে।

শুরু হল লীগ প্রতিযোগিতা।

ঠিক পাশাপাশি চলেছে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। কেউ ছোট নয়। কেউ বড় নয়। সবাই সমান।

মহাদেববাবু মহা খুশি। চুণী, অসীম, অশোক, বর্মণ, কান্নান, জার্নালের মত ছেলেরা যেখানে রয়েছে সেখানে সমান অসমান হতে আর কতক্ষণ।

ইস্টবেঙ্গল তো হোঁচট খেল বলে। তারপর একনাগাড়ে পাঁচ বছর লীগ চাম্পিয়ন হওয়া আর ঠেকায় কে?

হোঁচট কিন্তু মোহনবাগানই প্রথম খেল। রাজস্থানের কাছে তাকে একটি পয়েন্ট হারাতে হল।

আর যায় কোথায়! বন্ধু রসময়বাবুর ওখানে গিয়ে খবরটা শুনে সে কি তর্জন-গর্জন মহাদেববাবুর।

—খেলতে না পারিস তো খেলা ছেড়ে দে। তা বলে টীমকে ডোবাবি কেন। নইলে রাজস্থানের কাছে পয়েন্ট হারানো, একি একটা কথা হল!

—ছেড়ে দাও ভাই, ছেড়ে দাও। আক্ষেপ ঝরে পড়ে রসময়বাবুর কথায়—এখন কি খেলা বলতে আর কিছু আছে। খালি কায়দা আর কায়দা। সে ছিল আমাদের আমলে। শিবদাস ভাদুড়ী, বিজয়দাস ভাদুড়ী, হীরালাল মুখার্জী, গোষ্ঠ পাল, অভিলাস, সামাদ, কুমার, সূর্য চক্রবর্তী, হাবুল সরকার—এক একটা যেন যাকে বলে পুরুষসিংহ। এসব খেলোয়াড় কি আর হবে কোনদিন।

—বটেই তো। নিমেষে অতীতের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলেন মহাদেববাবু, শুধু ওরা কেন, নগেন কালী, পূর্ণ দাস, ননী গোঁসাই, সুরপতি মুখার্জী, মোনা দত্ত, রবি গাঙ্গুলী, মোনা মল্লিক, রবি বোস, তুলসী দত্ত, প্রশান্ত বর্ধন, ল্যাংচা মিত্র, ধীরা মিত্র, হেমাঙ্গ বোস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, হারান পলসাই, মন্মথ দত্ত, বিমল মুখার্জী, সুধাংশু বোস, বাঘা সোম—এরাও সবাই বাঘের মতই খেলে গেছেন।

—একশবার। সমর্থন জানালেন রসময়বাবু, তাছাড়া দীনেশ গুহ, ভোলা সেন, হীরা দাস, কমল গাঙ্গুলী, ভানু দত্ত রায়, প্রফুল্ল চ্যাটার্জী, কে. প্রসাদ, বেবী গুহ, মণি তালুকদার, ছনে মজুমদার, দুলাল, মুর্গেশ, রমন, লক্ষ্মীনারায়ণ, আপ্পারাও, সোমানা, হামিদ, দুলাল, হীরু সেন, ধীরা বোস, কে. দত্ত, শরৎ দাস, টি. রাও, পাখী সেন, আমেদ, নূর মহম্মদ, মজিদ, নায়ার, নন্দী, মেওয়ালাল, কাইজার, অনিল দে, রুনু গুহঠাকুরতা, পাগস্লে, অকিল আমেদ,

রসিদ, জুম্মা, মাসুম, রহমত, নাসিম, সেলিম, তাজ মহম্মদ, কে. ভট্টাচার্য—এরাও যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়ে গেছেন খেলার মাঠে।

—খুব সত্যি কথা। সায় দিলেন মহাদেববাবু, চট করে সবার নাম মনে আসছে না। নইলে নির্মল ঘোষ, ডি. ব্যানার্জী, নির্মল চ্যাটার্জী, সুনীল ঘোষ, পরেশ, বীরেন ঘোষ—এরাও কিছু কম ছিলেন না। আর মোহিনী ব্যানার্জী, মান্না, পরিতোষ, ব্যোমকেশ, পি. দাশগুপ্ত, রাখাল, ভেঙ্কটেশ, শ্রীকণ্ঠ ঘোষ, ধনরাজ, সালে, বলরাম—ওদের তো চোখের সামনে হতে দেখেছি হে।

—তা ঠিক। তবে সবদিক থেকে বিচার করতে গেলে এখনকার খেলোয়াড়দেরও একেবারে উড়িয়ে দেয়া চলে না। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের তো কথাই নেই। তার বাইরে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যেও যথেষ্ট ভাল ভাল খেলোয়াড় রয়েছে। যেমন ধরো, অরুণ ঘোষ, সঞ্জীব বোস, আপ্পালারাজু, এণ্টনী, আলতাপ, জন, সারমাদ, লতিফ—

—নিশ্চয়। এক বাক্যে সমর্থন জানালেন মহাদেববাবু,—শুধু ওরা কেন, উঠতি খেলোয়াড়রাই বা কম যায় কিসে। আমার তো মনে হয় উপযুক্ত সুযোগ পেলে মণ্টু, পি. সরকার, প্রণব, সুনীল, দুলাল, বিমান, দিলীপ ওরাও এককালে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে।

—বটেই তো। বললেন রসময়বাবু, তবে যাই বল ভাই, খেলা দেখে সুখ ছিল সেই গোরাদের আমলে। গোঁয়ার্তুমিই করুক, আর যাই করুক, খেলা দেখিয়েছে বটে। জার্ডিন, রাইপার, প্রাইস, গ্রেভস, নিকলসন, হুইট্‌লে, পেঁচো উইলসন, ম্যাকগুইব, সীম্যান, চার্চিল, স্মিথ, ডেভিডসন, মোটা ব্রাউন, ওয়েস্টকট, আর্মস্ট্রং ওরা কি খেলাই না দেখিয়ে গেছে সেদিন।

আর এখন! খালি কায়দা আর কায়দা। আর হবেই বা

কি করে। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। থাকতেন যদি স্যার দুঃখীরামের মত আর দু-একটি দরদী লোক, তবে এদ্দিনে খেলার মাঠের চেহারাই বোধহয় পালটে যেত।

—সেকথা হাজার বার সত্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল ফুটবল। আজ এরিয়ান্স ক্লাবের দিকে তাকাতে গেলে কথাটা যেন বড় বেশি করে মনে পড়ে। যাক, এবার একটা কাজের কথা বলি। অনেক কাল মাঠে যাইনি। যাবে নাকি একদিন! চল, দুই বুড়ো মিলে এখনকার কাণ্ড-কারখানা একবার স্বচক্ষে দেখে আসি। অসুবিধার কিছু নেই। গাড়ি তো রয়েছেই।

—তা মন্দ কি। সম্মতি জানালেন রসময়বাবু, চল, একদিন যাওয়া যাক।

ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজতেই স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন মহাদেববাবু।

তাইতো। কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার ওঠা যাক। ওদিকে কি ভাবছে কে জানে।

ঘন ঘন পথের দিকে তাকাচ্ছেন স্বর্ণময়ী দেবী। গেল কোথায় লোকটা।

কই, আগে তো কোনদিন এত রাত অবধি বাইরে থাকেনি। কি হল আজ।

—ভাবনার কিছু নেই মা। হাসি চেপে বলল সুবিনয়, বাবার আজ ফিরতে একটু দেরি হবে।

—কই, তা তো কিছু বলে যাননি। সংশয়ভরে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, কোথায় গেছে জানিস?

—আবার কোথায়! হাসতে হাসতে জবাব দিল সুবিনয়,

নিশ্চয় রসময় কাকার ওখানে। মোহনবাগান আজ এক পয়েন্ট হারিয়েছে কি না!

বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে কথাটা কানে যেতেই ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে গেল মহাদেববাবুর।

পরক্ষণেই তিনি গর্জে উঠলেন ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত, - কি! কি বললি হতচ্ছাড়া ছেলে!

—না, কিছু কয় নাই; সাফাই গাইতে চেষ্টা করে বলাই, আপনে ভুল শুনছেন।

—চুপ কর হতভাগা বাঁদর। এত বড় সাহস। বলে কি না মোহনবাগান পয়েন্ট হারিয়েছে বলে আমি রসময়ের ওখানে গিয়েছি।

—আপনি চুপ করুন বাবা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল মিতা, দেখবেন, পরের খেলায় মোহনবাগান খুব ভাল খেলবে।

—হুঁ! ভাল খেলবে। রাগে গজ গজ করতে লাগলেন মহাদেববাবু, ভাল খেললেই কি পয়েন্টটা ফিরে আসবে?

—আসবে বাবা। অভয় দিল মিতা, আমি বলছি আসবে। দেখবেন পরের খেলায় ইস্টবেঙ্গলও এক পয়েন্ট হারাবে।

—বলছ! আশায় আনন্দে বড় বড় চোখ করে তাকালেন মহাদেববাবু।

—নিশ্চয়। হাসি চেপে বলল মিতা, জানেন তো ইস্টবেঙ্গলকে বড় খেলায় যাই করুক না কেন, ছোট টীমের কাছে গোল খেতে ওদের জুড়ি নেই।

—ঠিক, ঠিক। মনের আনন্দে মাথা দোলাতে লাগলেন মহাদেববাবু, পচা শামুকে পা কাটতে সত্যিই ওরা বাহাদুর! খাঁটি কথা বলেছ বৌমা।

আশ্চর্য, মিতার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। পরের খেলায়ই এরিয়ান্সের কাছে ইস্টবেঙ্গলকে এক পয়েন্ট হারাতে হল।

খবর শুনে উল্লাসে ফেটে পড়লেন মহাদেববাবু।

এখন কি হল। আরে এ যে হতেই হবে। বৌমার কথা কি কখনো মিথ্যে হতে পারে!

যাও বৌমা, হতচ্ছাড়াটা এখন ঘরেই রয়েছে। হক্ নাহক্ সেদিন আমাকে কথা শুনিয়েছিল। আজ আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে এস। বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলবে। দরকার হলে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে। তারপর কিছু যদি হয় তো আমি আছি। যাও এক্ষুনি যাও—

কথামত স্বামীর ঘরে গিয়েই ফুঁসে উঠল মিতা,—এখন, এখন কি হল। পারলে তোমরা আমাদের মোহনবাগানকে ঠেকিয়ে রাখতে?

সুবিনয় অবাক। চোখে তার অর্থহীন দৃষ্টি। এ সবের মানে কি!

—চুপ করে রইলে কেন। মোহনবাগানকে তোমরা কি ভেবেছ শুনি। হঠাৎ চাপাস্বরে ফিস ফিস করে বলল মিতা, বাবার হুকুম! যা হোক কিছু জবাব দাও।

—হ্যাঁ দেবো। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠল সুবিনয়, একশবার জবাব দেবো। কি করে জবাব দিতে হয় ইস্টবেঙ্গল তা ভাল করেই জানে।

—ছাই। আর এক পর্দা গলা তুলল মিতা, দুদিনের বৈরাগী ভাতকে বলে পেসাদ। মনে রেখো আমরাই প্রথম শীল্ড নিয়েছি উনিশ শ' এগার সনে, আর লীগ নিয়েছি উনিশ শ'—উনিশ শ'—কত সনে যেন!

—উনচল্লিশ সনে। চাপা গলায় কথা ধরিয়ে দিল সুবিনয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উনচল্লিশ সনে। সতেজে বলল মিতা, আজ তোমাদের ইস্টবেঙ্গল! শীল্ড বা লীগ কোনদিন চোখে দেখেছ তোমরা?

চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলেন স্বর্ণময়ী দেবী।

বাইরে স্বামীকে আড়িপাততে দেখেই সহসা তীব্র সংশয় ঘনিয়ে এলো তার চোখের তারায়। কি ব্যাপার?

—এই যে। স্ত্রীকে দেখেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন মহাদেববাবু, শোন বড় বৌ, শোন। হতচ্ছাড়াটাকে বৌমা কেমন আচ্ছা করে শোনাচ্ছে, শোন। আর শোনাবে নাই বা কেন। এ তো আর ইস্টবেঙ্গল নয়, এ হল খাস মোহনবাগানের মেয়ে।

—ঢং দেখলে গা জ্বালা করে।

তিক্ত কণ্ঠে জবাবটা ছুঁড়ে দিয়েই যথাস্থানে ফিরে গেলেন স্বর্ণময়ী দেবী। রাতদিন কেবল ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। ভাল লাগে না বাপু।

ভেতরে তখন প্রচণ্ড ঝগড়া চলছে।

মিতার কি একটা কথার জবাবে সুবিনয় তখন সরোষে বলছে—আলবৎ। ইস্টবেঙ্গল ইচ্ছে করলে মোহনবাগানকে তার ঘড়ির পকেটে গুঁজে রাখতে পারে।

—কি? জ্বলে উঠল মিতা, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা। তোমাকে আমি—তোমাকে আমি—

—ত্যাজ্যপুত্র করব। কথা ধরিয়ে দিল সুবিনয়।

—অসভ্য কোথাকার। ফিক করে হেসে ফেলল মিতা। তারপরই আবার আগেকার মত সুর তুলে বলল,—তোমাকে আমি—তোমাকে আমি দারুণ শাস্তি দেবো।

—এখুনি দাও। আচমকা মিতাকে বুকে টেনে নিল সুবিনয়,—নইলে উলটে আমিই তোমাকে শাস্তি দেবো।

—আঃ! কি হচ্ছে এসব? চাপা গলায় বলল মিতা,—ভারী অসভ্য তুমি। ছাড়ো বলছি। ফের দুষ্টুমি। তাহলে আমি বাবাকে ডাকব। এই ডাকছি কিন্তু। বাবা—

—কি? কি হয়েছে! সজোরে চটীর শব্দ তুলে ঘরে ঢুকলেন মহাদেববাবু, কি করেছে হতভাগাটা?

—এ্যাঁ! গায়ের আঁচল ঠিক করতে করতে সহসা থতমত খেয়ে গেল মিতা, না না, মানে-মানে-উনি কিছু করেননি বাবা। বলছিলেন—বলছিলেন—

—কি বলছিল! ছেলের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন মহাদেববাবু।

—বলছিলেন—মানে—মোহনবাগান নাকি ইস্টবেঙ্গলের চাইতে—

—কি, এতবড় কথা। হুঙ্কার তুললেন মহাদেববাবু, মোহনবাগানের সঙ্গে সেদিনের ইস্টবেঙ্গলের তুলনা। ঘি আর ডালডা হল কি না এক!

—না না, উনি—উনি তা বলেননি বাবা। ঢোক গিলে বলল মিতা, বলছিলেন—বলছিলেন যে—প্রেষ্টিজের দিক থেকে মোহনবাগান নাকি ইস্টবেঙ্গলের চাইতে অনেক উঁচুতে।

—বলছিল! তাহলে ঠিক আছে। বীরের মত বুকটান করে আবার যথাস্থানে ফিরে গেলেন মহাদেববাবু। আর ফিরেও তাকালেন না।

—কি মজা। শ্বশুরকে চলে যেতে দেখেই চোখ পাকিয়ে বলল মিতা, আর অসভ্যতা করবে?

—অসভ্যতা না করলে খুশি হবে? পাল্টা প্রশ্ন করল সুবিনয়।

—যাও, জানিনে। হ্যাঁ গো, একটা কথা রাখবে ?

বলতে বলতে নিজেই এবার এগিয়ে এসে স্বামীর পাশে ঘন হয়ে দাঁড়াল মিতা। বোধহয় অসভ্যতার ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই বলেই।

—কি বল ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুবিনয়।

—এবছর একটাও খেলা দেখিনি। আব্দার ঝরে পড়ে মিতার কণ্ঠে, একটা খেলা দেখাও না গো।

—ঠিক আছে. আমি অবিনাশকে ব্যবস্থা করতে বলছি।

একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল সুবিনয়, তবে এখান থেকে সুবিধে হবে না। তুমি বরং ঐদিন ভোরেই মাণিকতলা চলে যেও। আমি অফিস থেকে সোজা ওখানে গিয়ে মিট করব। তারপর খেলা দেখে একসঙ্গে বাড়ী ফিরে আসব।

রাজস্থান বনাম মোহনবাগান দলের খেলা।

শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এপর্যন্ত কোন দলই গোল করতে পারেনি। মনে হয় শেষপর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

গ্যালারীতে পাশাপাশি বসে খেলা দেখছে সুবিনয়, মিতা আর অবিনাশ। প্ল্যানমত মাঠে আসতে তাদের কোন অসুবিধাই হয়নি।

পিত্রালয়ে যাবার প্রশ্নে এতটুকুও আপত্তি করেননি মহাদেব-বাবু। শত হলেও বৌমা ছেলেমানুষ। সংসারে আপন বলতে ঐ একটি মাত্র দাদা আর এক বৃদ্ধা পিসিমা।

পিসিমারও শরীরটা কিছুদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আপনজনকে দেখতে একটু ইচ্ছা করবেই তো।

ঠিক তার পাশের গ্যালারীতেই রসময়বাবুকে নিয়ে আয়েস করে বসে খেলা দেখছেন মহাদেববাবু। দীর্ঘ একযুগ বাদে আজ

আবার তাঁরা এসেছেন তাঁদের একান্ত প্রিয় মোহনবাগানের খেলা দেখতে।

খেলা শেষ হতে আর তিন মিনিট মাত্র বাকী।

হঠাৎ রাজস্থানের খেলোয়াড় পি. রায়ের সট্ থেকে আচমকা একটি গোল খেয়ে বসল মোহনবাগান।

সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের একাংশের সে কি বিচিত্র উল্লাস। শত্রু নিপাত। এবার ইস্টবেঙ্গলকে আর ঠেকায় কে!

অপ্রসন্নভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে সহসা কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে মহাদেববাবুর।

কে ঐ লোকটা পাগলের মত নৃত্য করছে পাশের গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে। ঐ হতচ্ছাড়াটা না!

তাছাড়া আবার কে। কিন্তু একি! ওর পাশে বসে ও কে! বৌমা না!

হ্যাঁ তাই। মোহনবাগানকে গোল খেতে দেখে এই মুহূর্তে যে সব চাইতে বেশী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, সে স্বয়ং মোহনবাগানের মেয়ে ছাড়া আর কেউ নয়।

সকাল থেকেই বলাই আজ মহাব্যস্ত। ইতিপূর্বে রাজস্থান ভার্সাস ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থান ভার্সাস মহামেডান দলের খেলায় সাপ্লাইয়ের বিজনেস থেকে তার মোটামুটি ভালই আয় হয়েছে।

আজ আবার সেই রাজস্থান দলের সঙ্গেই খেলা। সুতরাং প্রচুর স্টক্ থাকা দরকার। কখন কাজে লেগে যাবে কে বলতে পারে।

বলাইয়ের অনুমান মিথ্যে হল না।

রেফারীর একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সহসা উত্তাল হয়ে উঠল মাঠের একাংশের জনতা। তারপরই শুরু হল প্রচণ্ড ইষ্টক বৃষ্টি। ফলে মিনিট ছয়েক আগেই খেলা ভেঙে গেল।

রসময়বাবুকে পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টাদেড়েক বাদেই বাড়ি ফিরে এলেন মহাদেববাবু।

মিতা একটু আগেই এসেছিল। শ্বশুরকে ফিরতে দেখেই এবার সে ছুটে গেল উচ্ছ্বসিত আনন্দে।

—খবর শুনেছেন বাবা। মাঠে নাকি আজো গোলমাল হয়েছে। কি ব্যাপার বলুন তো বাবা?

—মাঠের খবর তো তোমারই বেশী জানবার কথা। মহাদেববাবুর সারামুখে শ্রাবণের গাম্ভীর্য।

—আমি! আচমকা আক্রমণে থতমত খেয়ে গেল মিতা।

—হ্যাঁ তুমি। থমথমে গলায় বললেন মহাদেববাবু, কেন, যাওনি তুমি আজ খেলার মাঠে?

—আমি—আমি—মানে—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। বারকয়েক ঢোক গিলে জবাব দিল মিতা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপার কি জানেন বাবা। দাদার কাছে দুটো বাড়তি টিকেট ছিল। আপনার ছেলে বললেন,—নষ্ট করে লাভ কি। চল আমরাই বরং দেখে আসি। তাই—

—তাই মোহনবাগানকে গোল খেতে দেখে ঐ হতচ্ছাড়াটার সঙ্গে অমন ধেই ধেই করে নাচ শুরু করা হচ্ছিল। রাশি রাশি তিক্ততা ঝরে পড়ল মহাদেববাবুর কণ্ঠে।

—না না, তা নয়। ত্রস্তে বাধা দিল মিতা, মানে—মানে—ওটা হল ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারী। ওরা যদি বুঝতে পারে যে মনে মনে আমি মোহনবাগানের সাপোর্টার, তাহলে কি অবস্থাটা হত বলুন তো বাবা? তাই তো বুকটা ফেটে গেলেও জোর করে—

—তাই বল। নিমেষে জল হয়ে গেলেন মহাদেববাবু, কি

আশ্চর্য ! একথা আগে বলতে হয়তো। আমি আরো সেই তখন থেকে—সে যাক্‌গে। বাড়ির খবর কি বল ?

—পিসিমার শরীরটা ভাল নয়। প্রাণে যেন জল এল মিতার, বেশিদিন আর বাঁচবেন বলে মনে হয় না। ছোটকাকা চিঠি দিয়েছেন। শীগগীরই একবার আসবেন বলে জানিয়েছেন।

—এলেই ভাল ! সহজ সরলভাবে বললেন মহাদেববাবু, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ই হল না এখনো পর্যন্ত। সে যাকগে। মাঠের অবস্থা তো নিজেই দেখে এসেছ। রেফারীর জন্য খেলাটা আজ—

—খেলায় হারলেই রেফারীর দোষ। পাশের ঘর থেকে মন্তব্য করল সুবিনয়।

—একথার মানে। যুদ্ধং দেহি ভাবে এগিয়ে এলেন মহাদেববাবু।

—মানে, তোমার কথাই আজ তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। জবাব দিল সুবিনয়, কেন, গতকাল রাজস্থানের সঙ্গে আমাদের গোলমাল হয়েছিল বলে তখন তুমি আমাকে একথা শোনাওনি। আজ কি হল ?

—হবে আবার কি। আমতা আমতা করে বললেন মহাদেববাবু, স্পষ্ট দেখলাম যে ফাউল করলে—

—সে বিচারের ভার তোমার আমার নয়, রেফারীর।

—বললেই হল। প্রতিবাদ করলেন মহাদেববাবু, খেলোয়াড়রা না হয় তা মেনে নিতে পারে, তা বলে সাপোর্টাররা সে-কথা শুনবে কেন ?

—সে কথা ইস্টবেঙ্গল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মুখের উপর জবাব দিল সুবিনয়, কিন্তু কই, সেদিন তো একথা একবারও মনে হয়নি। আজ নিজের আঁতে ঘা লেগেছে বলে বুঝি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জানা আছে। কেন যে আজ রাজস্থানের জন্ত এতটা দরদ উথলে উঠেছে তা আমার বুঝতে বাকী নেই।

কতকটা ইচ্ছে করেই আজ রণে ভঙ্গ দিলেন মহাদেববাবু। মনটা সত্যিই আজ তার ভাল নেই।

মুখে যাই বলুক না কেন, খেলার মধ্যে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতে কেন যেন তাঁর রুচিতে বাধে।

তা ছাড়া আজ অনেক দিন পরে মোহনবাগানের খেলা দেখে মনে মনে এতটুকুও খুশি হতে পারেননি তিনি।

কোথায় সেই মোহনবাগান? কোথায় তার সেই শিবদাস, বিজয়দাস, হাবুল সরকার, অভিলাষ, গোষ্ঠ পাল বা কুমারের মত কুশলী খেলোয়াড়রা।

আজ তাদের মত কেউ দলে থাকলে মোহনবাগানকে এভাবে দুটো পয়েন্ট হারাতে হত না। এর ফলে মোহনবাগানের পর পর পাঁচ বছর লীগ বিজয়ের আশাটা যে অনেকখানি অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে তা কে অস্বীকার করতে পারে।

ঠিক তখনই ঝড়ো কাকের মত বাড়ি ফিরে এল বলাই।

মাথায় পুরু ব্যাণ্ডেজ। চারপাশে জমাট বাঁধা চাপ চাপ কালো রক্ত। বোঝা যায় যে সে আহত।

বাড়ির প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন। কি ব্যাপার! কি হয়েছে বলাইয়ের?

—না, কিছু না! একগাল হেসে বলল বলাই—মাইর্ খাইছি।

—মার খেয়েছিস। উৎকণ্ঠায় বুকটা দুলে উঠল মহাদেববাবুর, কে মারলে?

—মারব আবার কে। বলাই নির্বিকার, নিজের অস্ত্রে নিজে ঘায়েল হইছি, দোষ দিমু কারে। তবে আর না কুট্টিমামা। খুব

শিক্ষা হইছে। বাপের ভাগ্য যে আইজ ফিরা আইছি। এরপর মাঠে যায় কোন হালায়।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রথমেই হো হো করে হেসে উঠল সুবিনয়। তারপর বলাই, তারপর বাদবাকী সবাই।

ব্যাপারটা বোঝা না গেলেও বলাইয়ের এই জখম হওয়াটা যেন হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন মহাদেববাবু।

ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। এবার ইস্টবেঙ্গল কাৎ। ইস্টার্ন-রেলের হাতে তাকে দুটি পয়েন্ট তুলে দিতে হয়েছে। সুতরাং মোহনবাগানের লীগ বিজয় সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—কি অন্যায় কথা। ছেলেকে খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না মহাদেববাবু, কোথায় ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে লীগটি নিয়ে ঘরে তুলবে, মাঝ থেকে ইস্টার্ন রেল কিনা ব্যাগড়া দিয়ে বসলে। শত্তুর আর কাকে বলে।

—শত্রু উপযুক্ত হলে ইস্টবেঙ্গল তাকে সম্মান দিতে জানে। সরোষে জবাব দিল সুবিনয়, প্রমাণ, খেলার শেষে শত্রুদলকে তারা যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েছে। শত্রুদলের যোগ্য সেনাপতি প্রদীপ ব্যানার্জীকে মাথায় তুলে নিয়ে নেচেছে। তোমাদের মত গোল খেয়ে ইঁট মেরে খেলা ভেঙে দেয়নি।

—কি বললি। রুখে উঠলেন মহাদেববাবু, ইস্টার্ন রেলের প্রথম খেলা, আর হাওড়া ইউনিয়ন থেকে ফোকটে চার পয়েন্ট পেয়ে আবার লম্বা লম্বা কথা।

—ইস্টবেঙ্গল খেলেই পয়েন্ট নিতে জানে। সতেজে জবাব দিল সুবিনয়, তার জন্য তাদের খুঁটির জোরের প্রয়োজন হয় না।

—তার মানে? এবার সত্যি সত্যিই রেগে গেলেন মহাদেববাবু।

—মানে তুমি ভাল করেই জান। রাশি রাশি ক্ষোভ ঝরে পড়ল সুবিনয়ের কথায়, কেন এবার লীগে ওঠানামা বন্ধ করা হল। গতবার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল বলে পরদিনই রাজস্থানকে দু' পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হল। এবার কেন ব্যাপারটাকে এ্যাদ্দিন ঝুলিয়ে রাখা হল? কার মুখ চেয়ে?

—যাদের মুখ চেয়েই হোক না কেন, এ-কথা জেনে রাখিস যে মোহনবাগান মোহনবাগানই। সুযোগ পেলেও দু' পয়েন্টের খাতিরে কিছুতেই তারা রাজস্থানের সঙ্গে খেলতে রাজী হবে না।

—তুমিও জেনে রেখো যে ইস্টার্ন রেল ও রাজস্থান দলের সঙ্গে প্রথম খেলা খেলতে ইস্টবেঙ্গল বরাবরই রাজী ছিল, এখনো আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের ইস্টবেঙ্গলকে আমার জানা আছে। দু' পয়েন্ট হারাতে হয়েছে কিনা, তাই আজ মোহনবাগানের নামে চুকলী কাটা হচ্ছে। কিন্তু কি হল তাতে। রাজস্থানের সঙ্গে খেলার দিনে খুব তো নাচানাচি করেছিলি সবাই মিলে, কিন্তু এখন কি হল। পারলি মোহনবাগানকে ঠেকাতে? এ জন্মেও তা পারবি নে।

কথাটা বলেই মনের আনন্দে বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন মহাদেববাবু।

আজ এই শুভদিনে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। বেশ বড় দেখে একটা মাছ আনতে হবে। উঃ, বৌমা কি খুশিই না হবে মাছটা দেখে।

কিন্তু কোথায় বৌমা?

মহাদেববাবু যখন মাছ নিয়ে ফিরে এলেন, মিতা তখন প্রচণ্ড মাথা ধরার যন্ত্রণায় একেবারে শয্যাশায়ী। মাছ খাওয়া তো

জ্বরের কথা, সে-রাত্রে বিছানা ছেড়ে ওঠাই আর তার পক্ষে সম্ভব হল না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল মহাদেববাবুর। এত সাধ করে বড় মাছটা আনা হল, আর বৌমা কিনা তার একটা টুকরোও মুখে তুলতে পারল না! এর পরে কি আর ও মাছ তাঁর পক্ষে মুখে তোলা সম্ভব।

অবশেষে একদিন এল সেই চরম খেলা। সেই ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের ফিরতি লীগের খেলা।

সকাল থেকেই সবাই উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে মহাদেববাবুর তো কথাই নেই। আজই মোহনবাগানের শেষ ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ঠাকুর কি মুখ তুলে চাইবেন না? লক্ষ লক্ষ ভক্তের আকুল প্রার্থনায় কি তিনি কর্ণপাত করবেন না?

কিছুতেই কিছু হল না। শেষ মুহূর্তে চরম আঘাত হানলেন ইস্টবেঙ্গলের সুকুমার সমাজপতি। ফলে মোহনবাগানকে এক গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

—থ্রি চীয়ার্স ফর ইস্টবেঙ্গল। বেতারে শেষ ফলাফল ঘোষিত হতেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল সুবিনয়, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

মহাদেববাবু অসাড় নিস্পন্দ। মনে হল তার চোখের সামনে অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু যেন এক সীমাহীন অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে গেছে।

মুহূর্ত মাত্র, তারপরই সহসা তিনি ফেটে পড়লেন বোমার মত। নেপথ্যচারী খেলোয়াড়দের লক্ষ করে সে কি তখন তাঁর তীব্র শাসানী।

—দূর করে দেব! সব ক'টাকে দল থেকে বের করে দেব! ফের যদি কোনদিন মাঠে দেখতে পাই তো ঠ্যাং ভেঙে দেব।

—সাবাস ইস্টবেঙ্গল। একই ভাবে হাততালি দিতে লাগল সুবিনয়, সাবাস সুকুমার। সাবাস সবাইকে।

—চোপরও। আচমকা বন্যজন্তুর মত গর্জে উঠলেন মহাদেববাবু, ভারি তো এদ্দিন বাদে লীগ পেয়েছে, তার আবার এত রোয়াব।

—কেন করব না। হাসতে হাসতে জবাবটা ছুঁড়ে দিল সুবিনয়, খুব তো বড়াই করেছিলে, পারল তোমাদের মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে রুখতে?

ধুত্তুরি তোর ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের নিকুচি করেছে। হঠাৎ বারুদের মত জ্বলে উঠলেন মহাদেববাবু, চুলোয় যাক, চুলোয় যাক সব। দূর হয়ে যাক।

সাপ্লাইয়ের বিজনেস উঠে যাবার পর থেকে বলাই সচরাচর বাড়িতেই থাকে। দাদুকে রেগে যেতে দেখে এবার সে আগ বাড়িয়ে বলল,—মাথা ঠাণ্ডা করেন দাদু, মাথা ঠাণ্ডা করেন। খেলায় হারজিত আছেই! তার জন্য মাথা গরম কইরা লাভ নাই। কুট্টিমামা, দিদিমা, কুট্টিমামী, যে যার ঘরে যান। খামাকা ভিড় জমাইয়া লাভ নাই।

বলতে বলতে সবাইকে ঘর থেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বলাই। আপাতত দাদুকে একা থাকতে দেয়াই ভাল।

সবাই চলে যাবার পরে অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন মহাদেববাবু। একটা তীব্র দংশনে সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্ছিল তাঁর।

এই তোদের মনে ছিল! এতবড় আশাটাকে কিনা তোরা এভাবে নষ্ট করে দিলি! আর তা দিলি কিনা ঐ ইস্টবেঙ্গলেরই হাতে। এর পর ঐ হতচ্ছাড়াটার সামনে মুখ দেখানোও যে ভার হয়ে উঠবে।

ঠক্-ঠক্ ঠক্-ঠক্। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ।

দরজা খুলতেই ঘরে এসে ঢুকলেন সামরিক পোশাক পরা একজন জাঁদরেল অফিসার। হাতে তাঁর বেশ কতকগুলো মিষ্টির প্যাকেট।

—আমার নাম দ্বিজেন মুখার্জী। হাসতে হাসতে বললেন অফিসারটি,—মিঠু—মানে, মিতা আমার ভাইঝি।

—কি আশ্চর্য! মনের চাঞ্চল্য যথাসম্ভব গোপন করে অভ্যর্থনা জানালেন মহাদেববাবু, আসুন-আসুন। আপনার সঙ্গে তো বলতে গেলে এখনো পর্য্যন্ত পরিচয়ই হয়নি। তা কলকাতায় কবে এলেন?

—আজই সকালে। আসন গ্রহণ করে বললেন দ্বিজেনবাবু, ছুটি কি আর পাবার উপায় আছে। অথচ এদিকে এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলা। এ খেলা মিস্ কি করে করি বলুন। তাই অনেক বলে-কয়ে একদিনের জন্য চলে এসেছি। আজ রাত্রের প্লেনেই আবার ফিরে চলে যেতে হবে পুণায়।

—তা এসেছেন, বেশ করেছেন। সৌজন্য সহকারে বললেন মহাদেববাবু, তবু তো পরিচয়টা হল। কিন্তু এ কি; হঠাৎ এত মিষ্টি কেন?

—শখ হল, তাই নিয়ে এলাম। হাসতে হাসতে বললেন দ্বিজেনবাবু, জানেন তো এককালে আমি ইস্টবেঙ্গলের রেগুলার প্লেয়ার ছিলাম। ভাইপো অবিনাশও মাঝে মাঝে খেলে বলে শুনেছি। তবে সবার উপরে হল আমার ঐ ভাইঝিটি। ইস্টবেঙ্গল বলতে যাকে বলে একেবারে পাগল।

—ইস্টবেঙ্গল! কানের কাছে বাজ পড়লেও বুঝি এতখানি চমকে উঠতেন না মহাদেববাবু।

—তবে আর বলছি কি। সহাস্যে বললেন দ্বিজেনবাবু, কোনদিন ইস্টবেঙ্গল হারল তো ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে সেদিন তার খাওয়া বন্ধ।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহাদেববাবু।

এই জন্যই তাহলে সেদিন বৌমা তার এত সাধ করে আনা মাছগুলো স্পর্শ করেও দেখেনি!

মাথা ধরাটা তাহলে একটা ছল মাত্র। সেদিন খেলার মাঠের ব্যাপারটাও তাহলে মিথ্যে নয়।

—এতবড় একটা সুখবরের পরে ভাবলাম যে কিছু মিষ্টি-টিষ্টি নিয়েই যাই। একই ভাবে বলতে লাগলেন দ্বিজেনবাবু, মেয়েটা দেখলে হয়তো খুশী হবে।

—আপনি বসুন। আমি বৌমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রাণহীন পুতুলের মত উঠে দাঁড়ালেন মহাদেববাবু। তারপরই আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন অন্দরমহলের দিকে। আর ফিরেও তাকালেন না।

মাত্র একদিনের ছুটি, তাই দ্বিজেনবাবুর পক্ষে আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা সম্ভব হল না। মিতার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তিনি চলে গেলেন তাঁদের মাণিকতলার বাড়িতে।

নিজের ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন মহাদেববাবু।

ইতিমধ্যে কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে সে খেয়ালও তাঁর নেই। মনে তার ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়।

এই তাঁর এত আদরের মোহনবাগানের মেয়ে—বৌমা। এই তার আসল পরিচয়। জেনেশুনেই সে তাহলে এতকাল তাকে ঠকিয়ে এসেছে। সে প্রতারক।

—বাবা। এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল মিতা, মিষ্টিটা খেয়ে নিন বাবা। ছোটকাকা এনেছেন।

—মিষ্টি! বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে গেল মহাদেববাবুর, ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। এ মিষ্টি তো তোমাদেরই বেশী করে খাওয়া উচিত বৌমা।

—বাবা! তীক্ষ্ণ একটা আর্তধ্বনি গলার মাঝখানে এসেই থেমে গেল মিতার।

যে পিতৃতুল্য শ্বশুরের চোখদুটি দিয়ে সর্বক্ষণ অনাবিল স্নেহ ঝরে পড়ত, এ তো সে নয়। সেই স্নেহের সুর কোথায় গেল!

—এগুলো তুমি আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাও। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন মহাদেববাবু, তুমি অল্পদিন এ বাড়িতে এসেছ, তাই হয়তো জান না, তবে তোমার শাশুড়ি জানেন যে মিথ্যেকে আমি কতখানি ঘৃণা করি। তাই বলছি যে, আর—আর কোনদিন তুমি এভাবে আমার সামনে এস না। কোনদিনও না।

মিতা অনড়, নিস্পন্দ। চোখের সামনে তার পরিচিত জগৎটা কেমন যেন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে একটা বেমানান নিস্তব্ধতা নেমে এল গোটা বাড়িটার উপর। সবাই নিঃশব্দ। সবাই নিশ্চুপ। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

একটা অশুভ আশঙ্কায় বুকটা দুলে ওঠে স্বর্ণময়ী দেবীর।

বেশ একটু অনুযোগ দিয়েই তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন —তুমি কি বল তো। মেয়েটাকে এতবড় কথাটা বলতে কি তোমার একটুও মায়া হল না। সে তোমাকে বাপের মত দেখে—

—আমিই কি তাকে নিজের মেয়ের মত করে দেখিনি বড়বৌ ? কেমন যেমন অপরিচিত শোনাল মহাদেববাবুর গলাটা।

—তাহলে শুধু শুধু এ নিয়ে মাথা খারাপ করছ কেন ? খেলা খেলাই।

—হ্যাঁ, খেলা খেলাই। ধরা গলায় বললেন মহাদেববাবু, তা বলে মিথ্যেটা খেলা নয় বড়বৌ। মোহনবাগানকে আমি যতখানি ভালবাসি, খোকাও ইস্টবেঙ্গলকে ততখানিই ভালবাসে। বিশ্বাস কর, মুখে যাই বলিনে কেন, আসলে তার জন্য আমার এতটুকুও ক্ষোভ নেই। নিজেদের দলকে ভালবাসাটাই তো স্বাভাবিক।

তা বলে মিথ্যে কেন ? মোহনবাগানের বিরোধী বলে খোকাকে কি আমি ফেলে দিয়েছি! সব কথা খুলে বললে বৌমাকেই কি ফেলে দিতাম। তাহলে কি প্রয়োজন ছিল দিনের পর দিন এই মিথ্যে অভিনয়ের ?

বলার মত আর কোন কথাই খুঁজে পেলেন না স্বর্ণময়ী দেবী। কি বলবেন, বলার আছেই বা কি।

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান তো একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে কোথায় যে এই সহজ সরল মানুষটার লেগেছে, সে-কথা তার চাইতে বেশী আর কে জানে।

মিতা সব জানে। সব বোঝে। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পায় না। শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলে।

কি দুস্তর লজ্জা। তার চেয়েও বড় কথা—এ ব্যাপারে কত অসহায় সে। আজ তার জন্য এ বাড়ির প্রতিটি লোকের মন থেকে প্রশান্তি মিলিয়ে গেছে। এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়। মানুষ ভাবে এক হয় আর। নইলে জীবন যে তার সঙ্গে এমন

একটা নিষ্ঠুর পরিহাস করবে তা কি সে ভাবতে পেরেছিল কোনদিন।

কিসের অভাব ছিল তার! কি সে পায়নি!

পেয়েছে উপযুক্ত স্বামী। পেয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ির অনাবিল ভালবাসা।

কিন্তু আজ? আজ তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।

ইতিমধ্যে প্রায় একমাস কেটে গেছে। এই এক মাসের মধ্যে শ্বশুরমশাই তাকে একবারও কাছে ডাকেননি। একটি কথাও বলেননি।

এরপর আর এ-বাড়ির পুত্রবধূর দাবী নিয়ে দাঁড়াবে কোন মুখে। কোন যুক্তিতে।

কিছুই নজর এড়ায় না স্বর্ণময়ী দেবীর। দু-চোখে তার নিবিড় সংশয়। কোথায় সেই চঞ্চল হাসি-খুশিতে ভরা বৌমা!

বৌমার মুখখানি যেন বাসি রজনীগন্ধার মালা। প্রতি পদক্ষেপে তার পরাজয়ের গ্লানি। দুঃখ ও বেদনার ভারে সে যেন একেবারেই মুষড়ে পড়ছে।

নজর এড়ায় না সুবিনয়েরও। এই ক'দিনের মধ্যেই মিতা যেন একেবারে বদলে গেছে। প্রায়ই চুপচাপ থাকে। মনে মনে কি যেন ভাবে।

হাত-পা বাঁধা এক অসহায় দুঃখের গুরুভার যেন একটা জগদ্দল পাথরের মত তার বুকে চেপে বসেছে।

—কি হয়েছে মিতা? প্রশ্ন করে সুবিনয়।

স্বামীর প্রশ্নে মুখ তুলে তাকাল মিতা। দীর্ঘ আয়ত চোখে কান্তিময় চাহনি; কোন অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, আছে শুধু বেদনার অভিব্যক্তি।

—অসুখ-বিসুখ করেছে কিছু? ব্যাকুলতা ঝরে পড়ে সুবিনয়ের কথায়।

—না না, আমার কিছুই হয়নি।

সব দৈন্য, সব ব্যর্থতা বুঝি ঐ মৌন দরদী দৃষ্টির সামনে ফেটে পড়তে চায় মিতার। সঙ্গে সঙ্গেই সে পালিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে। আজ সবার দৃষ্টির আড়ালে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন গতি নেই তার।

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে ওঠে সুবিনয়ের মুখ। এ যে আগামী ঝড়ের পূর্বাভাস। এ পরিস্থিতিতে কিছু একটা না করলেই যে নয়।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়াল সুবিনয়।

আর এখানে নয়। এখানে থাকা মানেই বিরোধকে প্রশ্রয় দেয়া। তার চাইতে নিজেই সে দূরে সরে যাবে মিতাকে নিয়ে।

পরদিনই বলাইকে ডেকে বলল সুবিনয়—কোথাও একটা ঘর দেখে দিতে পারিস বলাই?

—ঘর! বলাই তাজ্জব, ঘর দিয়া কি করবেন?

—তোর কুটিমামীকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে চাই।

—কন্ কি। যেন আকাশ থেকে পড়ল বলাই, মাত্র দেড় বছরের বড় হইলেও আপনে আমার গুরুজন। আপনের লগে তর্ক করন আমার সাজে না। কিন্তু কামটা কি ভাল হইব। বিশেষ কইরা কুটিমামীর এই অবস্থায়?

—উপায় কি! দাঁতে দাঁত চেপে বলল সুবিনয়, তোর কুটিমামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস কোনদিন। এভাবে সবার আড়ালে লুকিয়ে থেকে বাঁচতে পারে কেউ। তুই-ই বল।

—কি আর কমু। বড় করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল বলাই,

দেখি তো সবই। ঠিক আছে। কইছেন যখন, দৈইখা দিমু। তবে বুড়া বাপেরে ভুল বুইঝেন না কুটুমামা। দুঃখ কি তারই কম। অখনকার মাইন্‌সে দিনের মধ্যে হাজারটা মিথ্যা কথা কইতে না পারলে রাত্রে ঘুমাইতে পারে না, কিন্তু তখনকার মানুষের কথা আলাদা। একবার যদি মিথ্যা দেইখা বেকা হইয়া পড়ে তো সিদা করান মুস্কিল। ভুল করছি আমরাই। ব্যাপারটা চাইপা না রাইখা বিয়ার পরে যদি বেবাক গোমর ফাঁক কইরা দিতাম, তবে আর এই আকামটা হইত না।

অসাধ্য সাধন করল বলাই। সাতদিনের মধ্যেই সে ঘরের সন্ধান এনে দিল।

তবে পুরনো বাড়ি। দেড়খানা মাত্র ঘর। ভাড়াও অত্যধিক। মাস গেলে দেড়শ টাকা।

সুবিনয় এক কথায় রাজী। হোক পুরনো তবুতো ঘর।

মিতাকে বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া প্রয়োজন।

পরদিন ছেলের মুখে খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্বর্ণময়ী দেবী।

—এ তুই কি বলছিস খোকা। বুড়ো মানুষটার উপর রাগ করে এভাবে চলে যাবি! ওঁর মুখের কথাটাই কি সব। আর কিছুই কি দেখলিনে!

—বিশ্বাস কর মা, বাবার উপর আমার এতটুকুও রাগ নেই। কণ্ঠে কাতরতা ঝরে পড়ল সুবিনয়ের, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই। কালই আমরা চলে যেতে চাই। বাবাকে তুমি বুঝিয়ে বল।

খবর শুনে গুম হয়ে বসে রইলেন মহাদেববাবু। ভাল মন্দ

কোন কথাই বললেন না। যেন এ ব্যাপারে তাঁর কোন কিছুই আসে যায় না।

—এখনো চুপ করে থাকবে! বুক ভেঙে একটা কান্নার ঢেউ তোলপাড় করে ওঠে স্বর্ণময়ী দেবীর, এখনো মানা করবে না খোকাকে ?

—না বড় বৌ। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একটা হতাশার সুর ফুটে উঠল মহাদেববাবুর কণ্ঠে, উপযুক্ত ছেলে। সে যখন ভাল মনে করেছে, তখন ইচ্ছে হয় তো যাবে।

কথাটা বলেই ত্রস্ত সরে গেলেন মহাদেববাবু। বৌমার জন্য তার স্নেহটা কারো চাইতে কম নয়।

তবু এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়। মিথ্যের সঙ্গে আপোস করা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

পরদিন দূর থেকে শ্বশুরকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গিয়ে চোখের জল আর কোনমতেই বাধা মানলনা মিতার।

নিজের বাবার কথা তার মনেও পড়ে না। সংসারে এই একটিমাত্র মানুষ, যিনি তার সেই অভাব পূর্ণ করেছিলেন।

আজ তাঁর সান্নিধ্য থেকে তাকে দূরে চলে যেতে হবে। মন যেতে চায় না, তবু যেতে হবে।

তবু এত সহজে যেতে পারেনা মিতা। এই বাড়ী, এই ঘর, তার কত প্রিয়। কত দিবারাত্রির স্বপ্ন জড়ানো এই ঘর। জীবনের মধুগন্ধে ভরা দিনগুলি যেখানে কেটেছে, ছাড়তে চাইলেই কি তাকে এত সহজে ছাড়া যায়! তবু উপায় কি! যেতেই যে হবে।

বজ্রাহত বনস্পতির মত ভেতরে ঠায় বসে রইলেন মহাদেববাবু। একটি কথাও বললেন না।

একবারও কেঁপে উঠলনা তাঁর চোখের পাতা।

সংসার অতি কঠিন, কঠোর। শিশুসুলভ ভাবালুতায় ভেঙে পড়লে সংসার চলে না।

নতুন সংসার। নতুন পরিবেশ।

দুটি মাত্র লোক। সুবিনয় আর মিতা। সুবিনয় দশটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। বাসায় একা পড়ে থাকে মিতা।

কত কথা ভীড় করে আসে মনে। একটার পর একটা। অনেক কথা। অনেক আবেগ।

স্বপ্নমধুর স্বার্থক দিনগুলির আশায় কত স্বপ্নই না সে দেখেছিল। কোথায় গেল সব!

কেউ নেই। কেউ নেই। তার কল্পনার উপরে নির্মম মুঠিতে একটা যবনিকা টেনে দিয়ে সবাই আজ দূরে সরে গেছে একে একে।

কি আছে আজ তার জীবনে। অতীতের সঞ্চয় বলতে মনের পরতে পরতে আঁকা আছে শুধু পুঞ্জীভূত ব্যাথা-বেদনার ইতিহাস। জমার ঘরে শূন্য। শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

একই অবস্থা মহাদেববাবুর। ভাল লাগে না। ভাল লাগে না এই নিয়মের রাশটানা নিরানন্দ জীবন।

একটি একটি শুধু আসে ম্লান দিন, আর অনেকগুলো বিষাক্ত মুহূর্ত।

চারিদিকে এত হাসি, এত আলো গান, কিন্তু বুকের মধ্যে কোথায় যে একটা কান্নার পাখী ডানা ঝাপটে মরে, সে খবর কেউ জানে না।

ঘুরে ফিরে সেই একই চিন্তা ঘুর্নি হাওয়ার মত মনের গভীরে ঘুরপাক খেতে থাকে বারবার

বৌমা! বৌমা! বৌমা! বৌমা নেই। মোহনবাগানের মেয়ে চিরদিনের মতই মোহনবাগান ছেড়ে চলে গেছে।

ভাবনা থেকে রেহাই পাবার জন্য মাঝে মাঝেই তখন তিনি দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেন বাইরের দিকে। দূরে বহুদূরে। যতদূরে দেখা যায়। আকাশের দূরদিগন্তে।

ক্লান্ত, বিষণ্ণ হৃদয়ে এমনি করে শুধু চেয়ে থাকা। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। কোথাও পালাতে ইচ্ছে করে। সাংঘাতিক একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে।

তারপরই আবার সব স্থির। না, কোন উপায় নেই। এই তার ভাগ্য লিপি। ভাগ্যের এই মর্ম্মান্তিক পরিহাসকে নিঃশব্দে মেনে নেয়া ছাড়া আজ আর কোন পথই খোলা নেই তার চোখের সামনে।

বেচারা বলাই। কুট্টিমামার অবর্তমানে এরি মধ্যেই সে হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই যত কাজই থাক না কেন, এক ফাঁকে কুট্টিমামার কাশীপুরের বাসা থেকে তার ঘুরে আসা চাইই। কোনদিনই তার ব্যাতিক্রম হয়নি।

ফিরে এসে তাই নিয়ে দিদিমার কাছে কত গল্প।

—বোঝলেন দিদিমা, কথায় কয় যে সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। নইলে এমন দশা মাইন্‌সের হয়। তবে একজনরে দোষ দিয়া লাভ নাই দিদিমা, দুইজনেই সমান। যেমন দাদু, তেমন কুট্টিমামা। খালি জিদ আর জিদ। লাভটা কি হইল! অথন তো নিজেরাই কষ্ট পাইতে আছস্।

—বৌমা কেমন আছে? বলতে বলতে চোখদুটো ছল ছল করে ওঠে স্বর্ণময়ী দেবীর।

—আর বৌমা। কি কমু দিদিমা, একেবারে চাওয়ন যায় না। চব্বিশ ঘণ্টা খালি এক কথা,—বাবা কেমন আছে। ওষুধপত্র ঠিক মত খায় কিনা। মা যেন আমাগো লাইগা দুঃখ না করে,—এই সব কথা। তা বাবা মায় জন্য যদি এতই দুঃখ হয় তো সোজা চইলা আইলেই তো হয়। আইলে ঠেকায় কে। কন না দিদিমা, ন্যয্য কথা কইছি কিনা।

শুনতে শুনতে চোখের জলে বুক ভেসে যায় স্বর্ণময়ী দেবীর। স্বামী পুত্রের এই দ্বন্দ্বে সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু হাহাকার আর নীরবে অশ্রুমোচন করা ছাড়া আর কিছুই তার করণীয় নেই।

সকাল থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। জলে থৈ থৈ করছে চারিদিক।

রাজ্যের উৎকণ্ঠা নিয়ে বার বার পথের দিকে তাকাচ্ছেন স্বর্ণময়ী দেবী। কাশীপুর যাবে বলে বলাই সেই সাত সকালে বেরিয়ে গেছে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনো তার ফেরার নাম নেই। ওখানে কোন বিপদ ঘটেছে কিনা কে জানে।

বলাই ফিরে এল সন্ধ্যার পরে। দেখে বেশ একটু অনুযোগ দিয়েই বললেন স্বর্ণময়ী দেবী—খুব ছেলে যা হোক। আমি সেই তখন থেকে ভেবে মরছি।

—কন্, কন্। উল্টো অনুযোগ দিল বলাই, পাইছেন আমারে ভালমানুষ, যত পারেন কইয়া লন! নইলে এই যে সারাদিন প্যাটে কিল মাইরা হত্যা দিয়া পইড়া রইছি, সেই কথা একবারও কি কেউ কয়!

—কেন কি হয়েছে? উৎকণ্ঠায় বুকটা দুলে ওঠে স্বর্ণময়ী দেবীর।

—হইছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। বলাই নির্বিকার, গিয়া

দেখি কুট্টিমামী ব্যাথায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে আছে। খালি কয় যে—আমি মইরা যামু। বাবারে দেখুম, মায়রে দেখুম। সে যে কি কষ্ট। আমি তো দেইখা ভর্ ভর্ কইরা কাইন্দাই দিলাম। এদিকে কুট্টিমামা তখন অফিসে। কি আর করি। একখান ট্যাক্সী ডাইকা লইয়া গেলাম হাসপাতালে। তারপর সারাদিন সেইখানে। সন্ধ্যা নাগাদ কুট্টিমামায় গেলে তবে আমার ছুটি।

—কি হয়েছে বৌমার? রুদ্ধশ্বাসে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী।

—হইছে নাতি। বলাইয়ের সারামুখে একগাল হাসি, যান, অখন খালি বাড়িতে বুড়াবুড়ী গলা ধইরা নাচেন গিয়া।

প্রায় নাচতে নাচতেই স্বামীর কাছে ছুটে গেলেন স্বর্ণময়ী দেবী—ওগো, শুনছ? বৌমার ছেলে হয়েছে!

—হুঁ! আর একটি কথাও শোনা গেল না মহাদেববাবুর মুখ থেকে।

—দাদুভাইকে দেখতে যাবে না? কাতর একটা অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল স্বর্ণময়ী দেবীর কণ্ঠে।

—ওসব কথা থাক বড়বৌ। মহাদেববাবুর সারামুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য, দেমাক দেখিয়ে যখন চলে গেছে, তখন তাদের ব্যাপার তারাই বুঝুকগে।

—এখনো তুমি তোমার অভিমান নিয়েই থাকবে? একরাশ প্রবল কান্নাকে কোনরকমে সামলে নিলেন স্বর্ণময়ী দেবী, দাদুভাই-এর চাইতে তোমার অভিমানটাই বড় হল?

—আঃ! বিরক্তি ভরে সরে গেলেন মহাদেববাবু। রাতদিন শুধু ঘ্যান ঘ্যান আর প্যান প্যান। একটা মুহূর্তও সুখে-শান্তিতে থাকবার যো নেই।

কিন্তু কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি?

মহাদেববাবু অস্থির, চঞ্চল। বারবার কানের সামনে বেজে উঠছে সেই একই ডাক। একই আকুলতা।

দাদুভাই! দাদুভাই! তার দাদুভাই হয়েছে! লাল টুকটুকে দাদুভাই।

যথাসময়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এল মিতা। সারা মনে তার কূলপ্লাবী আনন্দ।

নারীর গৌরব আজ তার সর্বশরীরে। দেহের প্রতিটি রক্ত কণায়। প্রতিটি স্পন্দনে। সে মা হয়েছে। খোকনের মা।

তবু একটা গোপন কাঁটা খচ-খচ করে বিঁধতে থাকে সর্বক্ষণ। খোকনকে দেখলে যাঁরা সব চাইতে বেশী খুশি হতেন তাঁরা কেউ আসেননি।

একই প্রশ্ন উত্তাল হয়ে ওঠে সুবিনযের মনেও। আশ্চর্য, বাবা একবারও এলেন না। মাও না। কি করে এটা সম্ভব হল।

এমনি করে কেটে গেল আরো সপ্তাহখানেক।

হঠাৎ একটা দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল গোটা সংসারটার উপর।

সুবিনয়ের হঠাৎ জলপাইগুড়িতে বদলীর আদেশ হযেছে। অনেক চেষ্টা করেও সে আদেশ রদ করা সম্ভব হয়নি।

আপাততঃ সবাইকে ওখানে নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তার নিজেরই আস্তানার ঠিক নেই। এ পরিস্থিতিতে দিনকয়েকের জন্য মিতা ও খোকনকে কোথায় রাখা যায়?

অবশ্য পিসিমা বেঁচে থাকলে অনায়াসেই অবিনাশের কাছে পাঠিয়ে দেয়া যেত, কিন্তু তিনিও গত হয়েছেন প্রায় মাসদুয়েক আগে। সুতরাং সেখানে রাখাও খুব একটা সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয় না।

—কি ঠিক করলে গো? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকায় মিতা। দীর্ঘ আয়ত চোখে ক্লান্তিময় চাহনি। হতাশায় ভরা।

—বলাই আসুক, তারপর দেখি কি করা যায়। সুবিনয়ের দুচোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কিছুটা অসহায়তারও।

পরদিন সকাল সকাল বলাইকে স্নান-খাওয়া সেরে নিতে দেখেই স্বর্ণময়ী দেবী অবাক। কিরে, আজ এত তাড়া যে? যাবি নাকি কোথাও?

খেতে খেতেই বলল বলাই, যামু একটু ধর্মতলায়। কিছু জিনিসপত্র কিনাকাটা করতে হইব। কাইল কুট্টিমামা চইলা যাইব কিনা।

—চলে যাবে! স্বর্ণময়ী দেবী স্তম্ভিত। কোথায় যাবে খোকা?

—যাইব জলপাইগুড়িতে। বলাই নির্বিকার, না গ্যালে চাকরী থাকব' না। এদিকে সংসারের ঝামেলা। বউ-পোলা থাকব কই। কইলাম যে—লন যাই বাড়িতে, তা কে কার কথা শোনে। কয় যে—খবর পাইয়াও যখন বাবা মা'য় নাতির মুখ দেখতে আইল না, তখন ঐখানে যামু কোন মুখে। তার থিকা ঝি রইল, দেখা-শোনা করব। কি আর কমু। কমুই বা কারে। নইলে বাড়িতে বুড়াবুড়ী না থাকলে কি ঝি-চাকর দিয়া কোনদিন পোলাপান মানুষ করন যায়! নাঃ! পোলাটারে আর বাঁচান যাইব না। আমি অখন উঠি। কুট্টিমামায় আবার আমার লাইগা ধর্মতলায় আইসা অপেক্ষা করব।

খবর শুনে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্বামীর কাছে ছুটে গেলেন স্বর্ণময়ী দেবী। সব কথাই তিনি খুলে বললেন একে একে।

—আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই বড়বৌ।

—তার মানে এখনো তোমার সেই জেদ। প্রতিবাদ করলেন

স্বর্ণময়ী দেবী, কিন্তু কেন? কি চাও তুমি বলতে পার? দেখা-শোনার অভাবে ঐ একফোঁটা ছেলেটা মরে যাক, তাই কি তুমি চাও?

—বড় বৌ! তীক্ষ্ণ একটা আর্ত চীৎকারের মতই কথাটা বেরিয়ে এল মহাদেববাবুর মুখ থেকে।

—কেন বলবোনা। সরোষে বললেন স্বর্ণময়ী দেবী, এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি কিন্তু আজ আর করবো না। কেন করবো। কি করেছে ওরা তোমার। কি অপরাধ করেছে। বরং তোমার অন্যায় জেদের ফলেই ওরা এভাবে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহাদেববাবু। স্ত্রীর এই কণ্ঠস্বর তার অচেনা। এতদিনকার চেনা মানুষটি যেন এই মুহূর্তে একেবারেই বদলে গেছে।

—বৃথাই তুমি মোহনবাগানের ভক্ত বলে রাতদিন বড়াই করো। এবার স্বামীর সবচাইতে দুর্বল জায়গায় ঘা দিলেন স্বর্ণময়ী দেবী,—মোহনবাগানের উদারতার কথা আজ সারা দেশবাসী জানে। কিন্তু কই, তার ভক্ত হয়ে নিজের বেলায় তুমি তো তার ছিটে ফোঁটাও দেখাতে পারলে না। আসলে·তুমি তাদের কেউ নও। তা যদি হতে, তবে মোহনবাগানের মতই উদারতা দেখিয়ে ওদের এই সামান্য অপরাধটা তুমি ক্ষমা করতে পারতে। কেউ নও বলেই তা পারোনি।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহাদেববাবু। এত বড় অপবাদ! তিনি মোহনবাগানের কেউ নন!

না না, মিথ্যে কথা। তার সমগ্র চেতনাকে মন্ত্র মুখর করে রেখেছে মোহনবাগান। মোহনবাগানের চাইতে প্রিয় তার কাছে আর কিছুই নেই।

তবু স্ত্রীর এই অভিযোগটাকে উড়িয়ে দেয়া চলে না। ভুল তারই। মোহনবাগানের মতই উদারতা দেখিয়ে সেদিন বৌমার ঐ বয়েস সুলভ চপলতাটাকে তার ক্ষমা করা উচিত ছিল। তাতে আর কিছু না হোক এই অনিবার্য্য দুর্যোগটাকে সহজেই এড়ানো যেতো।

আজ সে আশা সুদূর পরাহত। কোনদিক থেকে এতটুকু সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়েই বৌমা আজ অনেকখানি দূরে সরে গেছে। এই চিরন্তন বিচ্ছেদকে আজ তিনি জোড়া লাগাবেন কিসের জোরে। কোন যুক্তিতে। সে অধিকার আজ আর তাঁর কোথায়!

—তোমার একমাত্র বক্তব্য বৌমা তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। অন্তরের সমস্ত পুঞ্জীভূত জ্বালা যেন মুখে এসে জমা হল স্বর্ণময়ী দেবীর, বেশ মানলাম। কিন্তু জেনেশুনে এভাবে দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে মিথ্যের অভিনয় করতে তারই কি কম দুঃখ হয়েছে! কম লজ্জা করেছে' তবু কেন করেছিল? করেছিল তোমার জন্য।

—আমার জন্য! বিস্ময়ে চোখের মনিদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল মহাদেববাবুর।

—হ্যাঁ তোমার জন্য। একই ভাবে জবাব দিলেন স্বর্ণময়ী দেবী, সত্য কথা শুনলে তুমি দুঃখ পাবে, তাই। এটাকে যদি তুমি মিথ্যে বলতে চাও তো বলতে পার, তবে আমি বলব যে এ মিথ্যের দাম সত্যের চাইতেও বেশী। সুতরাং অন্যায় যদি কেউ করে থাকে তো বৌমা করেনি, করেছ তুমি।

চাবুক খাওয়া জানোয়ারের মত নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মহাদেববাবু, তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন ক্ষিপ্তের মত।

—করেছি তো বেশ করেছি। আরো করব। হাজারবার

করব। তাতে কার কি। ঠিক আছে, আমিও দেখছি। এর উপযুক্ত জবাব যদি না দিতে পারি তো আমার নাম মহাদেব চাটুজ্যেই নয়।

সত্যই জবাব দিলেন মহাদেববাবু। বলাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবিনয়ের বাসায় গিয়ে হামলা শুরু করে দিলেন উন্মত্তের মত।

—কই। সে হতচ্ছাড়া কুলাঙ্গারটা! আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন। এই যে বৌমা।

—বাবা। ত্রস্তে ছুটে গিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করল মিতা।

সেই নিবিড় মায়া জড়ানো সম্ভাষণ। আজো তেমনি সুরেলা। তেমনি মধুময়। দেহের তন্ত্রীগুলো কি এক অপরূপ রসস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। সাড়া দেবার ভাষা নেই।

মিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে গিয়ে অজ্ঞাতেই কখন চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে মহাদেববাবুর।

বৌমা। তার কত আদরের বৌমা। হোক সে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক, তবু তার কাছে মোহনবাগানের মেয়ে হয়েই সে বেঁচে থাকবে চিরকাল।

কিন্তু হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায়?

—উনি ধর্মতলা গেছেন বাবা। কুণ্ঠিত নতমুখে জানাল মিতা।

—হুঁঃ। ধর্মতলা। আসুক আগে, ওর ধর্মতলা যাওয়াটা আমি বার করছি। হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলে। বুড়ো বয়েসে ভুল করে না হয় একটা কথা বলেই ফেলেছি, তা তুই আমাকে উল্টে দশটা কথা শুনিয়ে দে। হতভাগা তা না করে কিনা দেমাক দেখিয়ে চলে এল। কুপুত্র। কুপুত্র। নইলে বুড়ো বাপ-মাকে কেউ এভাবে দুঃখ দেয়। কিন্তু আমার দাদুভাই! দাদুভাই কোথায়?

—এই যে। বিছানা থেকে নিজেই খোকনকে তুলে নিয়ে আবেগ বিহ্বল স্বরে বলতে লাগলেন মহাদেববাবু, এই যে আমার দাদুভাই। এই যে আমার মোহনবাগানের চুণী দাদুভাই।

কি দাদুভাই, পারবিনে তুই চুণীর মত খেলোয়াড় হতে। পারবিনে ঐ ইস্টবেঙ্গলকে গণ্ডায় গণ্ডায় গোল দিতে! পারবিনে তোর হতচ্ছাড়া বাপটার দেমাক ভাঙতে।

হ্যাঁ পারবি। তুই-ই পারবি। আর যদি ঐ পরিমলের মত ইস্টবেঙ্গলে খেলতে চাস তো তাতেও আমার কোন দুঃখ নেই। তবে বুড়ো দাদুর দিকে চেয়ে গোলটোলগুলো একটু বুঝে-সুজে দিস দাদুভাই।

কিন্তু একি কাণ্ড।

ঘরের চারপাশে বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহাদেববাবু। তারপরই আবার তাঁর কণ্ঠস্বর চড়তে লাগল ধাপে ধাপে।

—হতচ্ছাড়ার এতবড় সাহস। আমার বৌমা, আমার দাদু-ভাইকে কিনা এনে তুলেছে একটা নোংরা, ভাঙা পুরনো বাড়িতে। ওকে আমি আজই ত্যাজ্যপুত্র করব। এক্ষুনি করব।

করলেনও তাই। বলাইকে নিয়ে ধর্মতলা থেকে ফিরে এসে সুবিনয় অবাক।

আশ্চর্য, কেউ নেই বাড়িতে। সব ফাঁকা। শুধু দরজার কড়ার গায়ে লাগানো রয়েছে ছোট্ট একটি চিরকুট।

লেখা রয়েছে—আমার বৌমা ও দাদুভাইকে আমি লইয়া গেলাম, এবং সেই সঙ্গে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া গেলাম। আর এক কথা। দাদুভাইয়ের নাম পরিমল রাখিতে চাও তো রাখিতে পার, তবে ডাকনাম হইবে চুণী। আশা করি ইহাতে

আপত্তি করিবে না। আপত্তি না করিলে তোমার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারে।

না, সুবিনয় কোন আপত্তি করেনি। বলাইকে দিয়ে যথা-সময়েই সে তার সম্মতি জানিয়ে দিয়েছে।

॥ শেষ ॥